সান্ত্বনা।

[বিবিধ প্রবন্ধ]

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

Take Sidney's maxim: "Look in thy heart and write." He that writes to himself writes to an eternal public. That statement only is fit to be made public, which you have come at in attempting to satisfy your own curiosity.

When a man speaks the truth in the spirit of truth, his eye is as clear as the heavens. ****Never was a sincere word utterly lost. Never a magnanimity fell to the ground, but there is some heart to greet and accept it unexpectedly.

There are not in the world at any one time more than a dozen persons who read and understand Plato:—never enough to pay for an edition of his works; yet to every generation these come duly down, for the sake of those few persons, as if God brought them in his hand.

Ralph Waldo Emerson.

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীতারিণীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও ২০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

আনন্দ আশ্রম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

সান্ত্বনা।

[বিবিধ প্রবন্ধ]

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

"Take Sidney's maxim "Look in thy heart, and write" He that writes to himself writes to an eternal public That statement only is fit to be made public, which you have come at in attempting to satisfy your own curiosity

"When a man speaks the truth in the spirit of truth, his eyes is as clear as the heavens ****Never was a sincere word utterly lost Never a magnanimity fell to the ground, but there is some heart to greet and accept it unexpectedly

"There are not in the world at any one time more than a dozen persons who read and understand Plato never enough to pay for an edition of his works, yet to every generation these come duly down, for the sake of those few persons, as if God brought them in his hand *Ralph Waldo Emerson*

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,

শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত ও ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

আনন্দ আশ্রম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

সূচী।

উৎসর্গ।

প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, M. R. C. P. LONDON

সখা,

মর্ম্মজীবনের উষায় মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণে আপনার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি, আজ সে মূর্ত্তি আমার নিকট কত মিষ্ট, কত মধুর হইয়াছে, পৃথিবীর কেহ তাহা জানে না। এক এক দিন বসিয়া, অনিমেষ নয়নে, আপনার ঐ স্নেহমাখা মধুর মূর্ত্তি দেখিতেই কেবল ইচ্ছা করে। সময়ে সময়ে তাহা দেখিও। এমন করিয়া মেয়েকে পুরুষ দেখিলে, সে পুরুষকে মানুষ কত নিন্দা করে। আপনার কোন বাহ্যরূপ নাই, অথচ আমি আত্মহারা ভাবে আপনার কি দেখি? এ সংসারের কেহ তাহা জানে না।

মানুষের সুখের দিন থাকে ত তার ধারে দুঃখের দিনও থাকে। জীবনের সুপ্রভাত থাকে ত, ঘোর অমাবস্যাও থাকে। মানুষ মিলনে পুলকিত, কিন্তু বিচ্ছেদও তাহারই জন্য। ঘোর আসক্তিময় সংসারের উপকূলেই ভীষণ শ্মশান। মানুষ, বৈচিত্র্যের তীব্র দংশনে সদা ব্যতিব্যস্ত। অবস্থা-বৈচিত্র্যের ঘোর পীড়নে সকলেই সদা অস্থির। কে কার মুখের দিকে চায়, কে কার চিন্তা করে,—সকলে আপনা লইয়া ব্যস্ত। ভালবাসার হাটেও এই চিত্র। সুখের দিনে, সুপ্রভাতে, মিলনের আনন্দে, সংসারের ঐশ্বর্য্যে বন্ধুরা সকলেই কাছে। কিন্তু দুঃখের তীব্র আক্রমণের সময়ে, অমাবস্যার গাঢ় আঁধারে, শ্মশানের ভীষণ চিতাপার্শ্বে বড় কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনাকে অনুকূল অবস্থায় দেখিয়াছি ত প্রতিকূল ঝটিকার দিনেও দেখিয়াছি। অপরাজিতার জন্মদিনে দেখিয়াছি ত তার মৃত্যু-সময়েও দেখিয়াছি। গিরিজা-সুন্দরীর মৃত্যু সময়ে আপনি সহরে ছিলেন না, কিন্তু তার পর যখন কলিকাতা পৌঁছিলেন, যখন অনেক বন্ধু ঘৃণায় আমাদের বাড়ীতে পা ফেলিতেন না, তখনও আপনাকে এ বাড়ীতে দেখিয়াছি। এমন সহৃদয়তামাখা, মুখে কথা নাই অথচ ভাবেগলা, এমন হৃদয়-দ্রবকারী গভীর মূর্ত্তির সমতুল্য চিত্র, আমার ধারণা, জগতে বড়ই

বিরল। যে বন্ধু সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, পাপে পুণ্যে, রোগে শোকে সমভাবে বন্ধুকে ভালবাসিতে পারে, এ পৃথিবীতে তার ন্যায় লোক আর কোথায় মিলে? আমি স্বার্থপর জীব, স্বার্থের বাজারে আপনাকে দেখিয়াই অবাক্ এবং মোহিত হইয়াছি।

অপরাজিতার স্বর্গারোহণ হইতে আজ পর্য্যন্ত কত লোকের শোকে আমরা দগ্ধ হইয়াছি, আপনি সে সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই শোকের ভিতরে আমরা যে "সান্ত্বনা" পাইয়াছি, তাহাও আপনি জানেন। আমাদের শোক আপনি যেরূপ আপনার ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের "সান্ত্বনা"ও তেমনি আপনার গ্রহণ করা উচিত। দুঃখের দিনে, শোকের দিনে আমরা যাহা পাইয়াছি, দুঃখের বন্ধু, শোকের বন্ধু আপনারই কেবল তাহাতে অধিকার। এই জন্যই বলি, "সান্ত্বনা" যেমন আমাদের, তেমনিই আপনার। আমাদের দুঃখে আপনার দুঃখ, আমাদের সুখে আপনার সুখ। আমাদের শোকে আপনি কাতর হইয়াছিলেন, আমাদের এই "সান্ত্বনা"র মূর্ত্তিতে আপনি আনন্দিত হইবেন না? হইবেন না, জিজ্ঞাসা করিতেছি কেন, আমি জানি, আপনি আনন্দিত হইয়াছেন, আপনি সান্ত্বনা পাইয়াছেন। আপনি যাহা পাইয়াছেন, তাহাই আজ অপরাজিতার জন্মদিনে আপনাকে লিখিয়া দিতেছি। সুখের দিনের জিনিসে অনেকের অধিকার, অনেককে তাহা দিয়াছি, দুঃখের দিনের জিনিসে আপনার ন্যায় সমদুঃখী ব্যক্তিরই অধিকার, তাই "সান্ত্বনা" আপনাকে দিতেছি। আপনি একদিন আমাদের শোকে কাঁদিয়াছিলেন, আজ একটু হাসিমুখে আমার সম্মুখে, সূর্য্যালোকে বা চন্দ্রালোকে দাঁড়ান, আমি দেখিয়া, আপনার দুঃখবিগলিত ঐ স্বর্গীয় কান্তি দেখিয়া সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা ভুলিয়া যাই।

আনন্দ-আশ্রম }
২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯। }

আপনার চিরাদৃত,
দেবীপ্রসন্ন।

সান্ত্বনা।

[বিবিধ প্রবন্ধ]

২৫৭

বঙ্গের প্রেমাবতার।

সসাগরা, সদ্বীপা পৃথিবী গভীর রজনীতে গাঢ় নিদ্রায় অচেতন—কল্পনার রাজ্য, চিন্তার রাজ্য, সব ঘোর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন, এমন সময়ে বঙ্গদেশের কোমল দেহ দারুণ ভূকম্পনে যেন সহসা বিকম্পিত হইয়া উঠিল, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, নরনারী, জ্ঞানী মূর্খ—সকলে সহসা চকিত, সুপ্তোত্থিত। যে কখনও জাগে না, সেও আজ জাগরিত। যে সদা চঞ্চল, সেও আজ স্পন্দহীন। কি যেন ঘটিয়াছে, কি যেন গিয়াছে, কি যেন ডুবিয়াছে—এইরূপ ভাবিয়া সকলেই অস্থির, সকলেই অধীর। ভাষাহীন মুখে সকলেরই চক্ষের জল, ভূষণহীন দেহে সকলেরই বিষাদের গাঢ় ছায়া। এমন দৃশ্য এ পোড়া দেশে কে কবে দেখিয়াছে? এমন জীবন্ত সহৃদয়তা-মাখা একপ্রাণতার কথা কে কবে শুনিয়াছে? সকলেই একপ্রাণে, একমনে, গলা ধরাধরি করিয়া, নীরবে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া ঘোষণা করিতেছে,—হায়, বিদ্যাসাগর নাই!!

পুণ্যাত্মা ম্যাট্‌সিনির মৃতদেহ ইতালীতে আনীত হইলে, ইতালীর সহস্র সহস্র নরনারী কিরূপ ব্যাকুল চিত্তে মৃত দেহের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়াছি; গ্যারিবল্ডির মৃত্যু-সংবাদ ইতালীতে ঘোষিত হইলে সে দেশ কিরূপ শোক-বিহ্বল হইয়াছিল, তাহার বিবরণও পাঠ করিয়াছি। সেও বহুদিনের কথা নয়, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্‌সিনি পরলোকে প্রয়াণ করেন ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, ঠিক দশ বৎসর পর, গ্যারিবল্ডি স্বর্গধামে গমন করেন। স্কুল, কলেজ, আফিস, দোকান ও থিয়েটার বন্ধ হওয়া বিচিত্র নয়, ইতালীর প্রায় সমস্ত লোক ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডির মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর দুই তিন দিন কোন কাজ করিতে পারে নাই; এমন অঙ্গ-শৈথিল্য, এমন ভাব-বিহ্বলতা, এমন দারুণ মর্ম্ম-বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। এদেশে

সেরূপ হইতে পারে, ধারণাও ছিল না। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে আংশিক-রূপে সে চিত্রের আভাস পাইতেছি। বিদ্যাসাগর এমনই সর্ব্বজনপ্রিয় পুণ্যাত্মা ছিলেন।

প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগেই গৌরবের কিছু থাকে। গৌরবের কিছু না থাকিলে, দেশ বা সমাজ টিকে না। প্রাচীন ভারতে গৌরবের অনেক জিনিস ছিল। বেদবেদান্ত, গীতাভাগবত, রামায়ণ মহাভারত প্রাচীন ভারতের গৌরব। ভবভূতি কালিদাস, বাল্মীকি বেদব্যাস, মনু যাজ্ঞবল্ক্য, অশোক বুদ্ধ, নানক কবীর, রামানন্দ শ্রীচৈতন্য—ভারতের প্রাচীন গৌরব। এখন সে সকল গৌরবের প্রাণ গিয়াছে,—সে সকলের কায়াহীন ছায়া, ভাব ও জীবনহীন স্বপ্ন, তেজোহীন কাহিনী কেবল এই ভারত-শ্মশানে বা প্রেত-ভূমে স্মৃতিতে বিচরণ করিতেছে। তবুও এ ভারতবর্ষ আছে কেন? তবুও এ দেশ ছিল কেন? কেন না—নব্যভারতেরও গৌরব ছিল। প্রাচীন ভারতের ন্যায় নব্যভারতের গৌরব রামমোহন, কেশবচন্দ্র কালের গর্ভে ডুবিলেও এ দেশের অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল, বিদ্যাসাগর ছিলেন। আজ সকলই কালের গর্ভে বা সময়-শ্মশানে লুক্কায়িত হইয়াছেন। হায় হায়, এ দেশ আজ হাহাকার করিবে না কেন, বলত? এত আঘাত কাহার প্রাণে সয়? নব্যভারত বুঝিবা আজ সর্ব্বপ্রকার গৌরবহীন হইতে চলিল। নব্যভারতের নব ভাষা-বধূ আজ আশ্রয়হীনা, পিতৃ-হীনা, দীনা, মলিনা, শোক-বিহ্বলা। বঙ্গদেশ আজ গভীর শোকে সমাচ্ছন্ন। বিষাদ-ময় রজনীতে দারুণ শোক বঙ্গাকাশকে অলক্ষিতভাবে হঠাৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

নব্য ইতালীর গৌরব যেমন ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডি, ফ্রান্সের গৌরব যেমন লেমিনে ও ভিক্টর হুগো, ইংলণ্ডের গৌরব যেমন গ্লাড্‌ষ্টোন ও কারলাইল, চীনের গৌরব যেমন কন্‌ফিউসস্‌, আমেরিকার গৌরব যেমন গারফিল্ড ও এমারসন, নব্যভারতের গৌরব তেমনি কেশবচন্দ্র ও বিদ্যা-সাগর। প্রাকৃতিক ভারতের গৌরব যেমন হিমালয়, প্রাণময় রাজ্যে নব্য-ভারতের তেমনি গৌরব, কেশবচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র। প্রাচীন যোগী ঋষিগণ যে একদিন এই পুণ্যভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এই দুই মহাত্মার আবি-র্ভাবে আমরা এ কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছি। পৃথিবীর গৌরবের বস্তু সকল (wonders) দেখিয়া পৃথিবীর নরনারী যেমন বিমো-

হিত, এই দুই মহাত্মাকে দেখিয়া বঙ্গভূমি তেমনি মন্ত্রমুগ্ধ। ভারতের আদরের ধন, গৌরবের বস্তু, এই দুই মহাত্মায় নিবদ্ধ। কলিকাতায় দেখিবার যদি কিছু ছিল, তবে ইঁহারাই ছিলেন, কলিকাতায় যদি কাহারও কথা শুনিবার ছিল, তবে ইঁহাদের মধুময় উপদেশপূর্ণ কথাই ছিল। একজন শ্রেষ্ঠ ভক্তিতে, আর একজন শ্রেষ্ঠ প্রেমে। দুইয়ের ভক্তি ও প্রেম, গঙ্গা যমুনার ন্যায় ভারত প্রয়াগে সম্মিলিত হইয়া ভারতের অপূর্ব্ব মঙ্গলের ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। ভক্তি আর প্রেমই ভারতের মৌলিক জিনিস। প্রাচীন ও নব্যভারতের গভীর যোগ-কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু আজ স্খলিত, বিলোড়িত। গঙ্গায় আজ উজান বহিতেছে, যমুনায় আজ ঘোর তুফান। তাই ভারত আজ প্রভা বা প্রবাহহীন হইয়া নীরবে দুঃখকাহিনী জগতে ঘোষণা করিতেছে। লোকের মুখে আজ আর কথা সরে না, আজ আর লেখনী চলে না, আকুলপ্রাণে কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেই ইচ্ছা হইতেছে।

যে বিদ্যাসাগরের জন্য আপামর সাধারণের প্রাণ মন শিথিল, এবং গভীর শোকোচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা,—কত কথা কতজনে বলিতে চায়, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কেহই বলিতে পারে না, এই বিদ্যাসাগর মহাশয় কে এবং কি ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর নানা জনে নানা রকমে, সভা সমিতিতে, ঘাটে পথে, কাগজে কলমে দিতেছে। কেহ বলে, বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার জন্ম, কেহ বলে ৭১ বৎসর বয়সে, বীরের ন্যায়, বহু কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বলে তিনি বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিয়াছিলেন, কেহ বলে তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী, কেহ বলে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয় অতি আশ্চর্য্য, কেহ বলে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, কেহ বলে মেট্রপলিটান কলেজ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি, ইত্যাদি রূপে কতজনে কত কথায় তাঁহার পরিচয় দিতেছে। কেহ সে পুণ্যময় দেহের দয়ার কথা, কেহ পরোপকারের কথা বলিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছেন। এ সকল অবান্তরিক কথায়, ঘটনায় ও গল্পে এই অতলস্পর্শ মহত্ত্বের খনি আবিষ্কৃত হইতেছে কি না, বড়ই সন্দেহের বিষয়। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের তেজ বল আর কোমলতা বল, জ্ঞান-স্পৃহা বল আর ভাববিহ্বলতা বল, স্বাধীনতা-স্পৃহা বল আর মাতৃ-ভক্তির কথা বল, ন্যায়পরায়ণতা বল বা দেবদুর্ল্লভ অপরাজিত দয়ার কথা বল, এ সকলই এক অজেয় অখনিত মহত্ত্বের খনি হইতে উদ্ভূত। সে মহত্ত্ব কি, কেহ আজ পর্য্যন্ত তাহা সম্যক্‌রূপে আবিষ্কার করেন

নাই। তাহা আবিষ্কৃত হওয়া বহুসময়-সাপেক্ষ, আমাদের ন্যায় প্রেমহীন, শুষ্ক, কঠোর কর্ত্তব্যহীন লোকের সাধ্য নাই যে, তাহা প্রকাশ করিতে পারে। আমরা উপহাসাস্পদ হওয়ার জন্যই সে চেষ্টা করিতেছি। ধিক্ আমাদিগকে।

আধুনিক জগতে আমরা এমন মনোমুগ্ধকর দুটী চিত্র দেখিয়াছি, যাহার সমতুল্য চিত্র বর্ত্তমান সময়ে কুত্রাপি মিলে নাই। এক চিত্র ইতালীর ম্যাট্‌সিনি, আর এক চিত্র বঙ্গের বিদ্যাসাগর। দুই-ই মাতৃভক্ত, দুই-ই দেশ ভক্ত, দুই-ই দরিদ্রের মা বাপ। শৈশব হইতে ম্যাট্‌সিনি এমন প্রেমে মাতোয়ারা যে, দেশের দুর্দ্দশার কাহিনী প্রকাশের জন্য সর্ব্বদা মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন *। ম্যাট্‌সিনি-জীবনে অন্য সুখের কামনা নাই, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব দেশ-সেবা,ও দরিদ্রের সেবায় নিবদ্ধ। অনাহারে থাকিয়া অন্যকে খাওয়াইতে, দরিদ্রের সেবার জন্য মাতার ভালবাসা (যাহার জন্য ম্যাট্‌সিনি পাগল ছিলেন) পর্য্যন্ত ভুলিতে, দেশের উন্নতির জন্য আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া কারাবাস যন্ত্রণা প্রসন্ন চিত্তে সহ্য করিতে, এই পৃথিবীতে কেবল ম্যাট্‌সিনিকে দেখিয়াছি। মহাপুরুষেরা নিজের সুখের দিকে চাহিতে পারেন না। "অন্যের কত অভাব, কত মানুষ দিবসে একবার আহার পায় না, আর আমি বিলাসের দাস হইব?"—প্রকৃত পরদুঃখ কাতর মহাপুরুষের কথা এইরূপ। সে মহাপুরুষই নয়, দুঃখীর জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে না। ম্যাট্‌সিনি দেশের দরিদ্র-সাধারণের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন পাত করিয়াছিলেন; এই জন্য আমরা ম্যাট্‌সিনিকে প্রেমাবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি †। ঈশা, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, সকল মহাপুরুষই দরিদ্রের জন্য আসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সহৃদয়তায়, দয়ায়, কর্ত্তব্যপরায়ণতায়, মাতৃভক্তিতে ও দরিদ্র সেবায় এই সকল মহাপুরুষের সমশ্রেণীর লোক বলিয়া বোধ হয়। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ম্যাট্‌সিনি প্রেমে মাতোয়ারা; আর আমাদের দরিদ্র দেশের দরিদ্র বিদ্যাসাগর শৈশব হইতে পরের জন্য অস্থির। প্রেমের টানে ম্যাট্‌সিনি অম্লানচিত্তে কারাবাসে গিয়াছিলেন, এই প্রেমের টানে বিদ্যাসাগর নির্ভীক চিত্তে নদী সাঁতরাইয়া মাতৃধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পায়ে সামান্য চটীজুতা, গায়ে একখানি মোটা উড়নী, বেশের মধ্যে এই,—বিদ্যা-

* "I childishly determined to dress always in black, fancying myself in mourning for my country." *Mazzini.*

† বিবেকবাণী, ৪৫ পৃষ্ঠা।

সাগর সর্ব্বদা আড়ম্বরহীন, বিলাসিতাহীন, সংসারের সুখ-বাসনাহীন। বিদ্যা-সাগরের আহার সামান্য, পরিধেয় সামান্য, অথচ বিদ্যাসাগর গবর্ণমেণ্টের কত সম্মান ও ভালবাসার পাত্র। দরিদ্র বিদ্যাসাগর নিজ চেষ্টায় স্বাবলম্বন বলে শেষজীবনে বার্ষিক প্রায় ৫০ সহস্র টাকা আয় দাঁড় করিয়াছিলেন। কার জন্য এই টাকা, এই ঐশ্বর্য্য!—সব দরিদ্রের জন্য। শুনিয়াছি, বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য এক সময় তাঁহার ৮০ হাজার টাকা ঋণ হইয়াছিল। কত লোকে ভিক্ষা দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। ভিক্ষাকে যে তুচ্ছজ্ঞান না করে, সে মহৎই নয়। ভিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া, ঘোর দারিদ্র্য-সংগ্রামে স্বীয় দুর্জ্জয় শক্তিতে জয়লাভ করিয়া এ সমস্ত টাকা তিনি নিজ আয় হইতে পরবর্ত্তী জীবনে পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন। একদিন কথায় কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও ৺তারকচন্দ্র প্রামাণিকের নাম উল্লেখ করিয়া, আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এ দেশে কেবল এই দুটী মানুষ আছে, আর সব পশু। পশুরাও নিজেদের লইয়া ব্যস্ত, ইহারাও তাই। কত ধনী এ দেশে আছে, কিন্তু এক বেলা দরিদ্রকে একমুষ্টি খাইতে দেয়, এমন লোক নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কণ্ঠরুদ্ধ হইল, অবিরল ধারায় চক্ষের জল পড়িতে লাগিল, আবার রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এ দেশের গতি কি ফিরিবে? নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের গতি কি ফিরিবে? হায়, তাহা-দিগকে আমরা পশু তুল্য জ্ঞান করি, মানুষের ন্যায় জ্ঞান করিলে হয় ত আমাদের দ্বারা তাহাদের কিছু উপকার হইত। আপনারা চেষ্টা করুন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এদেশের দরিদ্রদিগের গতি আর ফিরিবে না, তাদের মা বাপ নাই।" এইরূপ সহৃদয়তার কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অনেক বার শুনিয়াছি। শুনিয়া বিমোহিত চিত্তে ভাবিয়াছি—বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর, প্রেমের অবতার,—ভাবিয়াছি, এই গুণেই তিনি সর্ব্বজনপূজ্য।

আমরা অনেকবার অনেক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রেমই মানব জীবনের আদি মৌলিক জিনিস, তার পর জ্ঞান কর্ম্ম, ন্যায় ধর্ম্ম পুণ্য ও চরিত্র। প্রেমময়ী জননীর প্রেমক্রোড়ে স্বর্গের উলঙ্গ প্রেম-শিশু অবতীর্ণ। মাতৃক্রোড় হইতে এবং পরে সংসার হইতে আর সব সংগ্রহ। প্রেম হারাইয়া মাতৃক্রোড় হইতে যাহারা সংসারে অবতীর্ণ হয়, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, তাহারা অহঙ্কারে ধরাকে শরার ন্যায় জ্ঞান করে, অন্যকে উপেক্ষা করা তাদের জীবনব্রত, জ্ঞানে তাহাদের মনোবিকার,

ধনে আত্মাভিমান, বিদ্যায় গরিমা। পরনিন্দা তাহাদের গৌরব-পিপাসু হৃদয়ের প্রধান ভূষণ; পরশ্রী-কাতরতা তাহাদের প্রাণের আভরণ; হিংসার ঘাটে দুহাতে তুলিয়া তাহারা দুবেলা গরল পান করে। তাহারা বিলাসের দাস, রিপুর দাস, অহঙ্কার ও হিংসার দাস। সৌভাগ্যক্রমে আমরা সকলেই স্বর্গীয় প্রেম লইয়া অবতীর্ণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেই মাতৃক্রোড়ে সেই দেবদুর্লভ প্রেম বিসর্জ্জন দিয়া সংসারে নামিয়া, অপকৃষ্ট জীবরূপে লীলা খেলিতেছি।

ঈশা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্ত দেবশ্রেণীতে উন্নীত, সুতরাং তাঁহাদের কথা তুলিলাম না। যে সকল পুণ্যাত্মা প্রেম-মাতোয়ারা হইয়া সংসারে বাস করিতে পারেন; তাঁহারা নর-দেবতা, মানুষ দেবত্বে উথিত। দেবত্ব কিসে ? আমরা অনেকবার বলিয়াছি, কেবল প্রেমে। প্রেমই আরম্ভ, প্রেমই শেষ। প্রেমই জ্ঞান, প্রেমই কর্ম্ম, প্রেমই পুণ্য, প্রেমই মানবের সর্ব্বস্ব। দেবত্বের নিদর্শন, এই মর্ত্ত্যলোকে, এই এক ভিন্ন দুই নাই। প্রেম, নিষ্কলঙ্ক, বিকারশূন্ত, দ্বিধাশূন্ত, বাসনা-শূন্ত,—নিষ্কাম। প্রেমের স্বভাব—আত্মবিসর্জ্জন। দিতে দিতে, ধন, ঐশ্বর্য্য সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াও যখন তৃপ্তি হয় না, তখন গৃহ পরিবার, প্রাণ মন শরীর, সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া মানুষ পৃথিবী হইতে প্রস্থান করে। ম্যাট্‌সিনির জীবনে আমরা ইহারই উজ্জ্বল ছায়া দেখিয়াছি, বিদ্যাসাগরের জীবনে ইহারই প্রগাঢ় নিদর্শন পাইতেছি। উভয়ের প্রেমই মাতৃক্রোড়ে অঙ্কুরিত, উভয়েই মাতৃভক্ত। ম্যাট্‌সিনির কথা সকলে নাও জানিতে পারেন, কিন্তু সকলেই জানেন, বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি এদেশে অতুলনীয়। ইঁহারা, নিজেদের জন্ত নয়, অন্তের জন্ত, দেশের জন্ত জীবন ধারণ করিয়াছিলেন; তাহাদেরই জন্ত সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া শেষে পুণ্যধামে, স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।

ম্যাট্‌সিনি জীবনে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর জন্ত। বিদ্যাসাগর যাহা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে গভীর গবেষণা ও মস্তিষ্ক ব্যয় হইয়াছে বিধবাদের জন্ত। ইতালীর নিম্নশ্রেণী ও ভারতের বিধবা এক অবস্থাপন্ন। ম্যাট্‌সিনি নিম্নশ্রেণীর উন্নতির জন্ত জীবনের সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর বিধবাদের উন্নতির জন্ত ও দরিদ্রের সেবার জন্ত সর্ব্বস্ব—জীবনের বিলাস, সুখ, চিন্তা,ধন, মান, সম্ভ্রম, এমন কি শরীরের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া জল করিয়া ঢালিয়াছেন, এমন কি, পরসেবার জন্ত জাতি-চ্যুত, সমাজচ্যুত। ম্যাট্‌সিনির মৃত্যুর পর ৮০ হাজার সাধারণ লোক শোক-বিহ্বল চিত্তে ম্যাট্‌সিনির শবের সহিত গমন করিয়াছিল; হায়, বঙ্গের বিধবা, তোমরা কুসংস্কার

বা দেশীয় প্রথার বশবর্ত্তিনী, তোমরা কেহই তোমাদের উদ্ধারকর্ত্তার মৃতদেহের সহিত শ্মশানে যাইতে পার নাই। হায়, হয় ত তোমরা আজও বুঝিতে পারিতেছ না, তোমাদের জীবনের উন্নতির মূলে কি বজ্রাঘাত হইয়াছে! বিদ্যাসাগর যে তোমাদেরই জন্ত জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, এ কথা তোমরা কবে বুঝিবে? কে জানে কবে।। আর বাঙ্গালা ভাবা, তোমার জীবনদাতা যিনি, তিনি আজ শ্মশানের ভস্মে পরিণত, তোমার সাধ্যও হইল না যে, তুমি স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার কথা আঁক। কবে তোমার সে শক্তি হইবে, কে জানে?

প্রেমের আর এক স্বভাব, স্বাধীনতা বা স্বাবলম্বন-স্পৃহা। স্বাবলম্বন—আত্ম বিসর্জ্জনের রূপান্তর। যার স্ব বা আত্মবোধ আছে, সে-ই আত্মবিসর্জন করিতে জানে। পর-প্রত্যাশী, পর মুখাপেক্ষী, অধীন জীব পদে পদে অন্তের দিকে চায়, পদে পদে চলে। লোক কাছে আসিল, কি গেল, লোক ভাল বলিল, কি মন্দ বলিল, তাহারা এই সকল গণনা করিয়া মরে। আর স্বাধীন জীব, কর্ত্তব্য পালনের জন্ত আপনার শক্তির উপর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান। ম্যাট্‌সিনি যখন রাজাজ্ঞায় দেশান্তরিত হইয়াছিলেন, তখন ম্যাট্‌সিনির পিতা অনুরোধ করিয়াছিলেন, "একবার ক্ষমা চাও, তবেই মুক্তি পাইবে।" ম্যাট্‌সিনি পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন। পিতা সাহায্য বন্ধ করিয়া ম্যাট্‌সিনিকে দারুণ কষ্টে ফেলিয়া এই ক্ষমা প্রার্থনার পথে আনিতে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ম্যাট্‌সিনি অবিচলিত। ইংলণ্ডে অবস্থান কালীন এক-সময়ে ম্যাট্‌সিনির কর্ত্তব্য পরিত্যাগের জন্ত কত লোক, কত বন্ধু, কত উপদেশ, কত পরামর্শ দিয়াছিলেন, অবশেষে কত লোক কত প্রকার নিন্দা করিয়াছিল, ম্যাট্‌সিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ইয়ং সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটু লেখা সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন। কথায় কথায় ইয়ং সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করিলে যখন বিদ্যাসাগর ৫০০৲ বেতনের চাকুরি পরিত্যাগ করিলেন, তখন ছোটলাট সাহেবের অনুরোধের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "মাসে ২৲ টাকায় আমার এক সময় চলিত, এখন ৫৲ টাকায় চলিবে না? ভয় কিসের?" তারপর বিধবা বিবাহের আন্দোলনে—জাতি গেল, মান গেল, কত আত্মীয়ের অনুরোধ, কত পরামর্শ ব্যর্থ হইল; বিদ্যাসাগর একাকী ঘোরযুদ্ধে দণ্ডায়মান; ভ্রূক্ষেপ নাই। এক দিনের জন্তও কাহার সাহায্যের অপেক্ষা করিলেন না!! যাহা সত্য বুঝিয়াছিলেন, তাহা পালন করিবার জন্ত জীবনে যে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, ধারাবাহিক জীবন আলোচনা

করিলে তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"সৎ কাজ করিবার সময় লোকের নিন্দাকে, লোকের কথাকে ভুলিতে না পারিলে এ পথে যাওয়া ঘোরতর অন্যায়। আমাকে লোকেরা এতদূর নীচ কথা পর্য্যন্ত বলিয়া সময়ে সময়ে গালী দিয়াছে যে, আমি চরিত্রহীন বলিয়া অল্প-বয়স্কা বিধবাদিগকে বাড়ীতে আশ্রয় দেই!" বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত নিন্দা, কত নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, ইহাতেই যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অবিচলিত চিত্ত, একদিনের জন্যও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হন নাই। "যে যায়, যে থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক্।" যে যা বলে বলুক, আকাশ হইতে চন্দ্রসূর্য্য খলিত হইলেও বীরের কর্ত্তব্য অবহেলিত হয় না। প্রকৃত বীরত্ব এইখানে; প্রকৃত স্বাধীনতা এই খানে, প্রকৃত আত্মনির্ভর এই খানে। যাহা জীবনে কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন, প্রেমের টানে তাহার জন্য সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কাহারও দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। তোমার রত্নসিংহাসন, তোমার লক্ষ টাকার মায়া, তাঁহার নিকট তুচ্ছ। ধন্য বীরত্ব, ধন্য সাহস, ধন্য স্বাবলম্বন-স্পৃহা।

প্রেমের তৃতীয় রীতি দয়া। প্রেমিকের স্বভাব দয়াতে গঠিত। প্রত্যুপকারের আশায় যে দান করে, সে ব্যবসাদার; ভালবাসার বিনিময়ে যে ভালবাসা চায়, সে ঘোর নারকী। প্রেমের স্বভাব এই, সে কিছুই চায় না, সে কেবল দিতে চায়। পাত্রাপাত্র বিচারজ্ঞান থাকে না, যে অনিষ্ট সাধন করে, অথবা যে শত্রু, তাহাকেও সে দিবে, তাহাকেও ভালবাসিবে। এরূপ শুনা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা উপকৃত হইয়া, তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা বা নিন্দা ঘোষণা করে নাই, অতি অল্প ব্যক্তি। অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় পুনঃ পুনঃ সেই সকল ব্যক্তিদিগকেই, অকাতরে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, নানাপ্রকার সাহায্যে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "এক ব্যক্তি আমার নিন্দা করিয়াছে শুনিয়া বলিয়াছিলাম, কই, আমি ত তাহার কোন উপকার করি নাই, তবে সে কেন নিন্দা করিল?" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধারণা এইরূপ ছিল, উপকার করিলেই লোক নিন্দা করিবে। অথচ তিনি অকাতরে দান করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিই এইরূপ ছিল যে, অন্যের কষ্টের কথা শুনিলে ঠিক থাকিতে পারিতেন না। কোন প্রত্যাশা নাই,

প্রতিদানের আশায় ছাই, তবুও দান-স্পৃহা! কি অপরাজিত প্রেমের টান, ভাবিলে মোহিত হইতে হয়। একটা টাকা দিতে আমরা কত ভাবি, আর বিদ্যাসাগর লক্ষ লক্ষ টাকা দরিদ্রের সেবায় ঢালিয়া গিয়াছেন। কত লোকের উপকার করিয়াছেন, কত বিপন্নকে উদ্ধার করিয়াছেন, এ. জগতে তাহার তালিকা উদ্ধার হইবে না, কেননা, মহাজনের স্বভাব সেরূপ নয়। তিনি লোকের অজ্ঞাতে দান করিতেন। লোক জানাইয়া, সংবাদ-পত্রে ঘোষণা দিয়া যে দান করে, সে প্রেমিক নয়, সে যশ-লোলুপ। বিদ্যাসাগর, প্রকৃত দয়ার সাগর ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার শোকে সর্ব্বশ্রেণীর লোক আজ ব্যাকুল। দয়া সম্বন্ধে ম্যাট্‌সিনির সহিত তুলনা করিলাম না, কেননা, ম্যাট্‌সিনি নিজে উপবাসী থাকিয়াও আহারের দ্রব্য অনেক সময় অন্যকে দিতেন।

প্রেমের চতুর্থ স্বভাব—ভেদাভেদবোধহীনতা। প্রেমের চক্ষে বিষ্ঠা চন্দন সমান। বড় ছোট ভেদ নাই। যে বিদ্যাসাগর লাট সভায়, সেই বিদ্যাসাগর সাঁওতালের পর্ণকুটীরে; যে বিদ্যাসাগর রাজভবনে, সময়ান্তরে সেই বিদ্যাসাগর মুদির দোকানে সামান্যাবস্থায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। মুটে মজুরের সহিত সমভাবে ব্যবহার করিতেন বলিয়া বিদ্যাসাগরকে অনেক সময়ে বহু রাজা মহারাজার ভালবাসা হারাইতে হইয়াছে। দুঃখীর সেবা, দরিদ্রের পরিচর্য্যা, রোগীর শুশ্রূষা, বিদ্যাসাগরের জীবনের ব্রত ছিল। এজন্য তিনি না করিয়াছেন, এমন কাজ নাই। দরিদ্রের সেবার জন্যই যেন তাঁহার জন্ম। এগুণে তিনি খ্রীষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের সমতুল্য ব্যক্তি।

প্রেম-গুণের অনেক ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু আর অধিক উল্লেখ করিব না। প্রেমের প্রধান পরিচয়, গভীর জ্ঞানস্পৃহা ও কর্ত্তব্যস্পৃহায় পাওয়া যায়। প্রেমিক জগতে আবির্ভূত হন, জ্ঞানপ্রচারের জন্য, জগতের কাজের জন্য। প্রেম আছে, অথচ জ্ঞান নাই, কাজ নাই, এমন দৃষ্টান্ত জগতে নাই। "খাটিতেই জন্ম, খাটিয়াই মরিব—" প্রেমিকের কথা এই। ম্যাট্‌সিনি আজীবন জ্ঞানান্বেষণ করিয়াছেন, আজীবন খাটিয়া খাটিয়া মরিয়াছেন। আর প্রেমিক বিদ্যাসাগর,—আজীবন জ্ঞান-পিপাসু। উদাহরণ, তাঁহার অমূল্য পুস্তকালয়। তিনি আজীবন বিবিধ প্রকারে খাটিয়াছেন, পরিচয়, তাঁহার রচিত পুস্তক রাশিতে, দীন দুঃখীর সেবাতে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে। পতিত পরাধীন দেশের জন্য ম্যাট্‌সিনির

জ্ঞান ও কর্ম্ম উৎসর্গ হইয়াছিল, পতিত দেশের পতিত সমাজ-সংস্কারের জন্ত বিদ্যাসাগরের জ্ঞান ও কর্ম্ম নিঃশেষিত হইয়াছে। ম্যাট্‌সিনির পরিশ্রমের ফলে ইতালী আজ স্বাধীন। বিদ্যাসাগরের পরিশ্রমের ফলে আজ বিদ্যার আলোকে পতিত সমাজ অন্ধকার কুসংস্কার ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে; আর বঙ্গবিধবার জলসিক্ত নয়নের কোণে ঈষৎ হাসি-রেখা ফুটিতেছে। আজ হউক, আর শত বৎসর পরে হউক, এ পতিত দেশের নরনারী বিদ্যাসাগরের পুণ্যের প্রভাবে উত্থান করিবেই করিবে।

প্রেমের আর একটী কথা বলিলেই আমাদের সব বলা হয়। কথাটী এই, প্রেমই পুণ্য, প্রেমই ধর্ম্ম। কেহই একথা বলিতে সাহস পান না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় পুণ্যাত্মা ছিলেন না, চরিত্রবান্ ছিলেন না, কিন্তু কেহ কেহ একথা বলেন, তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন না। যিনি প্রেমিক, তিনিই উচ্চশ্রেণীর ধার্ম্মিক, এ কথা আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রেমাবতার, স্মতরাং তিনি উচ্চশ্রেণীর ধার্ম্মিক। প্রেমেরই নামান্তর ধর্ম্ম। প্রেমের মূল এমন এক রজ্জুতে আবদ্ধ, যাহার পরিসমাপ্তি নাই, যাহা অনন্ত, অপার। ধার্ম্মিকতা কথায় প্রকাশ পায় না। বর্ত্তমান সময়ে ধার্ম্মিকতার লক্ষণ, বক্তৃতা, বাহ্য পরিচ্ছদ ও বাহ্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন সময়ে এরূপ ছিল না। প্রকৃত ধর্ম্ম হৃদয়-অন্তঃপুরের গভীর গুহায় নিহিত থাকিত। ধর্ম্ম প্রকাশ পাইবার হইলে, দয়া দাক্ষিণ্যে, স্থায় পুণ্যে প্রকাশ পায়, পাউক, কিন্তু বক্তৃতায়, পোষাক পরিচ্ছদে যত কম প্রকাশ হয়, ততই ভাল। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম-সমাজ সমূহে এত আবর্জ্জনা জুটিতেছে যে, এখন ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক বাছিয়া লওয়া কঠিন হইয়াছে। আড়ম্বরহীনতা ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে সে পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে, অহঙ্কারশূন্যতা ধর্ম্মের দ্বিতীয় লক্ষণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থায় নিরহঙ্কারী লোক এ দেশে বিরল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ধর্ম্মের জীবন, বিদ্যাসাগরের স্থায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি এদেশে আর দেখা যায় না। পবিত্রতা ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান, বিদ্যাসাগরের স্থায় পবিত্রচেতা লোক এ দেশে বিরল। শেষ জীবনে পীড়ার জন্ত একটু অহিফেন সেবন করিতেন, তাহা ছাড়িতে যাইয়াই এবার প্রাণ হারাইলেন।। জীবনে কখনও কোনও নীতিবিরুদ্ধ অন্যায় কাজ করিয়াছেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই। ন্যায়-পরায়ণতা ধর্ম্মের লক্ষণ, এই ন্যায়পরায়ণতার খাতিরে আপন জামাতাকে

পর্য্যন্ত মেট্রপলিটান কলেজ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন! মিথ্যার প্রতি বিরক্তি, ইহার অন্যতর কারণ ছিল। মিথ্যার প্রতি, অন্যায়ের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ খড়্গহস্ত ছিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি এ দেশে সেরূপ দেখি না। স্ত্রীজাতির প্রতি তিনি যেমন সম্মান দেখাইতেন, এমন আর কেহ পারে কি না, জানি না। কোন সময়ে কয়েকটী যুবক মেট্রপলিটান কলেজের নূতন গৃহের ছাদে উঠিয়া ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের দেখিতেছিল। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রোধে অধীর হইয়া ছাত্রদিগকে কলেজ হইতে চিরদিনের জন্য অপসৃত করিয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ স্ত্রীজাতির শরীর মাটী করিতেছে দেখিয়া, ধর্ম্মবীরের ন্যায় দেশীয় প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া, আপন কন্যাদের যৌবনে বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। এ সকল সৎগুণ সত্ত্বেও যাঁহারা তাঁহাকে অধার্ম্মিক বলিতে সাহসী হন, তাঁহাদিগকে আর অধিক কিছু বলিবার নাই, কেবল তাঁহার কথা তুলিয়া দেখাইব, তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতদূর সরল বিশ্বাসী ছিলেন। এক সময়ে আমাদিগকে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কোন্ সমাজভুক্ত?" আমরা উত্তরে বলিয়াছিলাম—"ব্রাহ্ম, কিন্তু কোন সমাজভুক্ত নই।" একথার উত্তরে তিনি সানন্দচিত্তে বলিয়াছিলেন যে, "নিজকেই যখন নিকাশ দিতে হইবে, তখন একা থাকাই ভাল, দশে মিলিলে কাজ নষ্ট হয়।" আর একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা বলি না, কেবল বেতের ভয়ে। নিজের বেতের ভয়েই অস্থির, অন্যকে ধর্ম্ম কথা বলিয়া আরো বেত্রাঘাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ভয় পাই।" বেতের ভয় সম্বন্ধে একটী গল্প বলেন, সেটী এস্থলে দিলাম,—"মনে কর, সকলেই বিচারের দিন বিচারপতির সম্মুখে আনীত হইয়াছে। আমিও সেইখানে আনীত। বিচারপতি খাতা খুলিয়া নাম ডাকিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি অমুক দিন অমুক অন্যায় কাজ করিয়াছ? আমি উত্তরে বলিলাম, হাঁ, করিয়াছি। অমনি দশ বেতের হুকুম হইল। আমাকে বটতলা লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, আমি বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। একটু পরেই আবার আমার ডাক হইল। হাজির হইলে বিচারপতি বলিলেন, তুমি অমুক লোককে অমুক দিনে এই কথা বলিয়াছ? আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, হাঁ বলিয়াছি। অমনি আর দশ বেতের হুকুম হইল। যে লোক এব্যবহারে বলিয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর বলিয়াছিল বলিয়া এই কাজ করি-

য়াছি। এইরূপ বহুলোককে বহু কথা বলিলে, সে পাপের ভাগী আমাকেই হইতে হইবে ও আমিই দণ্ড পাইব, এই ভয়ে আমি কাহাকেও কোন ধর্ম্মের কথা বলি না।" এটী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজ মুখে আমরা শুনিয়াছি। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্মমতের সূক্ষ্ম মীমাংসা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে উচ্চশ্রেণীর ধার্ম্মিক ছিলেন, ইহাতেই তাহা প্রকাশিত। তবে, তিনি অন্ধভাবে কোন সম্প্রদায়ের সকল মত মানিয়া চলিতেন না, একথা ঠিক। সকল সম্প্রদায়ের লোককেই তিনি আদর করিতেন। এই জন্যই সকল সম্প্রদায় তাঁহার জন্য আজ শোকে অস্থির। পৃথিবীর কোন মহাজন কাহারও প্রদর্শিত পথে চলিতে পারেন না। মহাজনদিগের বিশেষত্বই এই, তাঁহারা আপন পথে আপনারা চলেন। এ দেশে প্রচলিত কথা এই, সে মুনিই নয়, যাঁর মত বিভিন্ন নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রেমে সর্ব্বত্র পরিচিত, ঐ প্রেম নিগূঢ় ধর্ম্মের ঘনীভূত আভাস মাত্র। যে স্বর্গীয় শক্তি তাঁহার অন্তরে সদা কার্য্য করিত, প্রেম তাঁহারই বিকাশরূপে জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এমন বীর, এমন আড়ম্বরশূন্য ধার্ম্মিক, এমন পুণ্যাত্মা এদেশে দুর্লভ। বোধোদয়ে যাঁহার ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ, সেই মহাত্মাকে অধার্ম্মিক যে বলে, সে মূর্খ। ম্যাট্‌সিনির প্রতি কথায় ধর্ম্মের ছায়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার মর্ম্মভেদ করিলেও ঐরূপ ধর্ম্মপ্রচারের ভাব প্রকাশ পায়। প্রেমিক প্রেমের কাহিনী লিখিতেই ভালবাসে, তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ সকলের লক্ষ্য যে কেবল ধর্ম্ম প্রচার, স্থূল বুদ্ধি নরনারী তাহা বুঝিতে অক্ষম, কেননা, তাহা ভাষা ও ভাবের অন্তরালে লুক্কায়িত। যে ব্যক্তি ধর্ম্মে প্রবীন, বিশ্বাসে অটল, সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার প্রতি ছত্রে ধর্ম্মের আভাস পাইয়া মুগ্ধ হয়। এমন মধুর লেখা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ।

ধর্ম্ম যেমন প্রেমের একাঙ্গ, প্রতিভা তেমনি অন্যাঙ্গ। তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিব না, কেননা, প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে; তবে এই মাত্র বলি, প্রতিভার অঙ্কুর প্রেমে প্রোথিত, প্রেমে পোষিত,—জ্ঞানে উন্মেষিত, জ্ঞানে বর্দ্ধিত। প্রতিভা ও প্রেম—পাশাপাশি জিনিস, অথবা ভাই ভগ্নী। দুই-ই কোমল, দুই-ই ভাবুক, দুই-ই মাতোয়ারা, দুই-ই স্বর্গের কুসুম। কাব্যেই হউক, আর ধর্ম্মেই হউক, জ্ঞানেই হউক, আর কর্ম্মেই হউক, দুইয়ের কার্য্য সমতুল্য। এক হীন হইলে অপর খেলে না। প্রেমহীন প্রতিভা, অথবা

প্রতিভাহীন প্রেম, দুই-ই আকাশকুসুম। ইহার যে সকল দার্শনিক যুক্তি আছে, সে সকলের উল্লেখ করিতে চাই না; তবে এইমাত্র বলি, জগতে যত প্রেমিক এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ঈশা, মুশা, শ্রীচৈতন্য, ম্যাট্‌সিনি, এমারসন, সকলেই প্রতিভান্বিত ব্যক্তি। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা এত তীক্ষ্ণ যে, মানুষের অন্তর ভেদ করিয়া তাহা প্রদীপ্ত হইত। যাঁহারা ক্ষণকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহবাসে থাকিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার প্রতিভার জীবন্ত চিত্র দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। কি গল্পে, কি উপহাসে, কি তর্কে, কি উপদেশে, এই প্রতিভা শতমুখী হইয়া প্রকাশ পাইত। সে নয়ন দুটী যেন প্রতিভার খনি, আবার সময়ান্তরে প্রেমের অস্ফুট ভাষা। একই জিনিস নয়ন, এক সময়ে প্রতিভা ও অন্য সময়ে প্রেমের ভাষা। এক সময়ে নয়ন উজ্জ্বল, এক সময়ে জলে অভিষিক্ত। ভাই ভগ্নীর ভাষা—একই নয়ন। আজ সেই নয়ন জ্যোতিহীন, প্রভাহীন, ভাবহীন—চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ। হায়, সেই প্রতিভার উজ্জ্বল খনি, প্রেমের অস্ফুট ভাষা আজ কোথায়? বিদ্যাসাগরকে হারাইয়া আমরা যে কি অমূল্যধন হারাইয়াছি, আজিও বুঝিতেছি না। এমন গৌরবের জিনিস এদেশে আর নাই, আর হইবে না। আমরা আজও অপ্রেমিক বলিয়া এই প্রেমাবতারের সম্যক্‌রূপ পরিচয় দিতে বা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করিতে অক্ষম হইতেছি। বিদ্যাসাগরের বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রচুর না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রেমেরই সহচর; বিদ্যাসাগর জীবনে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যৎসামান্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রেমেরই নিদর্শন। জগতে আজ তাহা উপেক্ষিত হইলেও একদিন তাহার আদর হইবেই হইবে। এক হৃদয়ের শক্তিতে বিদ্যাসাগর অমর হইয়াছেন; এক চক্ষের জলে বিদ্যাসাগর জগতের পূজ্য। জগত আজও বিদ্যাসাগরের পরিচয় পায় নাই, তাতে কিছু আসিয়া যায় না; ভারতের বিধবার অশ্রুতে, সাঁওতালদের দারুণ মর্ম্মবেদনায় ইহার গৌরব চিরকাল সুরক্ষিত থাকিবে। এমন সময় আসিবে, যখন পৃথিবীর সকল শক্তির স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু হৃদয়-শক্তির ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবে না। বিদ্যাসাগর হৃদয়-শক্তিতে পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছেন। এমন অপরাজিত হৃদয় এই নব্যভারতে আর দেখিতে পাই না। এই অপরাজিত হৃদয়-শক্তিতে বিদ্যাসাগর জগতে চিরকাল পূজা পাইবেন। আর সেই স্বর্গে, সেই অনন্ত পুণ্যধামে, প্রেমাবতার ম্যাট্‌সিনির পার্শ্বে দেবাসনে বসিয়া দেবশিশু বিশ্বপ্রেমের গুণ গাইয়া ত্রিলোককে মোহিত

করিতেছেন, চিরকাল করিবেন। বিদ্যাসাগর প্রেমে চিরকাল ইহজগৎ ও পরজগতে দেবতা বলিয়া অভিহিত হইবেন। ভারত, তুমি ধন্য যে, এমন প্রেমিকের চারণ-ভূমি বক্ষে ধারণ করিয়া আজ পৃথিবীকে আপন গৌরব জানাইতে সক্ষম হইতেছ। ভারতের জয়, প্রেমের জয়, বিধাতার জয়—এই জয়ধ্বনির নীরব-ঘোষণায় বিদ্যাসাগর বঙ্গভূমিকে কাঁপাইয়া গভীর রজনীতে স্বর্গে প্রয়াণ করিয়াছেন। বঙ্গভূমি আজি সুপ্তোত্থিত, আজও বুঝিতেছেন না, ভারত কি অমূল্যধনে বঞ্চিত হইয়াছেন। এমন দিন অদূরে, যে দিন ঘরে ঘরে এই বিদ্যাসাগরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইবে।

ভালবাসা-কালকূট।

ভালবাসা কালকূটের কথা আমাকে বলিও না, ভাব তার দানী, চঞ্চলা নদীর তীরে কলঙ্ক-চন্দন-বৃক্ষমূলে সেই কুসুম-দেহী কোমলাঙ্গীর বাস। সে কালকূট পান করিয়া আমি জর্জ্জরিত হইয়াছি,—আর আমাকে তার কথা বলিও না। সে না করিতে পারে এমন কাজ নাই,—সে যে কি নেশায় ভুলায়, জানি না, কিন্তু জগৎ তার জন্ত পাগল। শিব পাগল সতীর জন্ত, সীতা পাগলিনী শ্রীরামের জন্ত, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা এবং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের জন্ত পাগল এবং পাগলিনী। কেন, কি জন্ত, আমি তাহা বুঝিলাম না। দর্শন নাস্তিবাদ লইয়া, বিজ্ঞান অস্তি বা জড়বাদ লইয়া কতরূপে প্রতিপন্ন করিল, মনুষ্যের শরীরের অবয়ব নাই, সে মায়া, সে ছায়া, সে পরমাণু সমষ্টি, অথবা শ্মশানের ছাই। মৃত্যুর অপেক্ষা আর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কোথায় পাইবে? সে প্রত্যক্ষবাদ চক্ষের সম্মুখে ঘুরাইয়া চমক ভাঙ্গিয়া দেখাইল, বাস্তবিকই মানুষ শ্মশানের ছাই; তবুও, কি জানি কেন, তবুও মানুষের জন্ত মানুষ পাগল। শ্যাম-বাঁশরী আর বৃন্দাবনে নাই, কিন্তু তবুও শ্রীরাধার কুল ডুবাইল, মান ডুবাইল, জীবন ডুবাইল, হায় হায় আর রহিল কি? আমার সম্মুখে কেহ নাই, পশ্চাতে কেহ নাই—চতুর্দ্দিকে কেবল ফাঁপা নীরবতা, কেবল অনন্তপুরের অনন্ত তৃষ্ণা, আমি বিষে জর্জ্জরিত, আমার প্রাণ দিবানিশি হু হু ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। লোকে বলে "আমি মানুষের ভালবাসা কাড়িয়া লইয়াছি,—কিন্তু কাহাকেও ভালবাসা দেই নাই—আমি সজাগ কবি, আমি

মাতাইতে জানি, কিন্তু মাতি না। আমি যশের কুহকে, স্বার্থের ধাঁধায়; প্রলোভনের ছলনায় ঘুরি, ফিরি, উঠি বসি।" বাস্তবিকও আমি তাহাই। বন্ধু, আমাকে ক্ষমা করিয়া, পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাও, আর বৃথা ভালবাসার কথা বলিও না।

বাল্যকাল হইতে আমার বড় অহঙ্কার ছিল, তাই দম্ভসহকারে বলিতাম, "লোকের জন্ত আমি পাগল হ'ব? না—তা কখনই হইবে না।" এজন্ত আমি প্রেমের ঘর বাঁধি নাই—এজন্ত ছেলে খেলায় ভুলি নাই। বড় হইয়াও কঠোর তপস্তায়, কর্ত্তব্যের সেবায় পিতা মাতা গুরুজনের স্নেহ, ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহ, স্কুলের সমপাঠিগণের স্নেহ, যৌবনে বন্ধুদিগের স্নেহ, সব স্নেহ ভুলিয়াছি। মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন, পিতা নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইলেন,—আর যাঁহারা গুরুজন, তাঁহারা অনেক করিলেন, অনেক সহিলেন, শেষে আর পারিলেন না, আমাকে বিদায় দিলেন। কলেজে বা স্কুলে পড়িবার সময়ে সকলে আমার বাড়ী আসিত, আমি কাহারও বাড়ী যাই নাই,—ইহাতেই সব কথা বুঝিতে পারিবে। বাল্য সুহৃদ্ "কা ও গো", সহোদর "র", যৌবন-সুহৃদ্ "চ, জ, পা, ও অ"—সকলে নিরাশ হইয়া অন্ধকারে কান্না ডুবাইয়া চলিয়া গেল। তাঁহারা সকলে আজ অদৃশ্যপুরে মন প্রাণ বাঁধিয়াছেন। হায়, হায়, আমি কি পাষাণ? আমি আজও স্বপ্নে তাহাদের ছবি দেখিয়া অবাক হই, কিন্তু ধরা ছোঁয়া দেই না। হায়, আমি কি মানুষ? না—আমি সত্যই পাষাণ। এতদূর পর্য্যন্তও পাষাণ। কিন্তু অনন্তপুরের অনন্তদ্বারে তপস্যা করিয়া—"কা" হইতে "অ" সকলে মিলিয়া বিশ্বেশ্বরের যোগ ভাঙ্গিয়া, মন গলাইয়া, অবশেষে প্রেম-বিষ আমার প্রাণে ঢালিয়াছে। "অপরাজিতা" আমাকে কি করিয়া কোন্ তীর্থে কোন্ নৌকায় যেন উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে! সত্যই সে আসিয়াছিল—আর আজ সত্যই সে গিয়াছে। হায় হায়, আমি মানুষ হইলাম, পাখী হইলাম না কেন? আমি উড়িতে অক্ষম, সীমায় আবদ্ধ—অসীম অনন্তপুর কতদূর, কিছুই বুঝিলাম না। সে আমার প্রাণ কাঁদাইল! এতদিন পরে আমি কলঙ্ক-সাগরে ডুবিলাম। মানুষ শ্মশানের ছাই, তা'ত বেশ বুঝিয়াছি, কিন্তু তবুও আমি তার জন্ত পাগল! বন্ধু, তুমি ঠাট্টা করিলে, মুখ বক্র করিলে, কিন্তু আমার প্রাণ ত বুঝিলে না! প্রাণ বুঝা—তোমার কাজ নয়। ঠাট্টা, তিরস্কার, যশ, নিন্দা, প্রশংসা—তোমার হাসিমাখা মুখ বা চক্ষের জল, ও সব আমার নিকট সমান। বন্ধু, বল নগরে—"ডুবেছে রাই রাজ-

নন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্কসাগরে !” দেখিলাম ত আরো দেখিলাম না কেন ? পাইলাম ত আরো পাইলাম না কেন ? তার কথা শুনিলাম ত আরো শুনিলাম না কেন, এ সকল বুলি আমার নিকট শুনিবে না ! আমার ভাবা—“কি দেখিলাম !” “কি দেখিলাম !” অপরাজিতা অমৃত সাগরের ঢেউ, সে সুধা-সিন্ধুর নবনী, চাঁদ ছাঁকিয়া অমিয়া, কুসুম-জগতের সুষমা, অথবা সে যে কি, আমি তা জানি না। মানুষ, মানুষকে ভুলিয়া তারপর স্বপ্নে দেখে। আমি তাকে আর স্বপ্নে দেখি না। সে প্রত্যক্ষ, চির-প্রত্যক্ষ, চির-উজ্জ্বল, চির-নিকটস্থ। সে দেবীপুরের দেবী মূর্ত্তি, মাতৃমূর্ত্তি।

ছি, ছি, ছি—মানুষীকে দেবী বলিলাম ? ছি, ছি, ছি—এই বলিয়া সব বন্ধু, সব ভাই আজ দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পাগলের বাণী, প্রলাপের উক্তি শুনিতে কেহ আজ কাছে নাই। স্বার্থের পর স্বার্থ, তার পর স্বার্থ—সপ্তম স্বার্থ-দেশের পর তাঁহারা বাড়ী বাঁধিয়াছেন। আমি শুনিতেছি, তাঁহারা আমাকে ঘৃণা করিয়া এখন ভালই আছেন। আমি শুনিতেছি, তাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম এখন ভালই হইতেছে। আমি শুনিতেছি, দিন দিন তাঁহারা বড় লোকই হইতেছেন। কেহ তোষামোদে, কেহ যশে, কেহ প্রশংসা-স্তুতিবাদে তাঁহারা দশের মধ্যে একজন হইয়া আজকাল ভাল ভাবেই দিন কাটাইতেছেন। আর আমি ? ভবপুরে ভবঘুরে—যেই একাকী, সেই একাকী—কোলে সেই মাতৃমূর্ত্তি ! নিমতলার ঘাটে মায়ের রূপ ভাসাইয়াছি—আমার মা এখন নিরাকারা—চিন্ময়ীমূর্ত্তি। তিনি রূপের অতীতা—অরূপা, অথবা রূপ জমিয়া মহামায়ার মহারূপ। মা আমার, আমি মায়ের, এই দুটী কথায় আমার সব বেদ, বাইবেল, কোরাণ পরিসমাপ্ত। তোমার ব্রহ্মাণ্ডবেদ, রাশি রাশি পাঁজীপুথি আমার এই দুটী কথায়। আমি তর্কযুক্তি জানি না, দর্শনবিজ্ঞান ধুইয়া যাহা পান করিতে হয়, তোমরা কর, আমি আর কিছুরই নই, কেবল মায়ের। মা আমার কথা বলেন না, হাসেন না, কিছু দেন না, এইরূপ যত যুক্তি তর্ক থাকে, আমার নিকট লইয়া আসিয়া ভুলাও, আমি অলড়, আমি দেখিয়াছি, পাইয়াছি, তাঁর কথা শুনিয়াছি, আমি কিছুতেই তোমার ঐ সকল কথায় ভুলিব না। তোমার জন্ত অবিশ্বাস থাকে, ভাই, তুমি তাহা লইয়াই থাক ; আমি তাহা চাই না। আমার যাহা, আমি তাই লইয়াই থাকিতে চাই। আমি চাই, সেই স্নেহবিগলিতা, পার্শ্ব-প্রলোভনের অস্পৃশ্যা, পুণ্যসলিলা ভাগীরথীতে দেহ মন ডুবাইতে। সেই সংসারের

অতীতা, অপরাজিতা মাতৃমূর্ত্তি লইয়া আমি পাগল হইতে চাই। আমি নিমেষ-হারা যোগী, ভাব-হারা কর্ম্মী, জ্ঞান-হারা শিশু,—আমি সব-হারা হইয়া মায়ের হইতে চাই। আমি ছুটিতেছি, ফিরিতেছি,—আমি অস্থির হইয়াছি। আর আমাকে ভালবাসার কথা বলিও না, আমি তার জালায় সংসারে থাকিয়াও সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী।

তোমাদের ভালবাসার মায়ায় আমাকে আর পায়ে জড়াইওনা। ভাই, তুমি অনেক দিয়াছ, এখন একটু ক্ষমা কর। আমি তোমাদিগকে ধরিয়া অনন্তপুরে যাইব, ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু স্বার্থের হাটে আসিয়া হঠাৎ আমার চমক ভাঙ্গিয়াছে, এখন দূর হও। আমি আর ভালবাসিব না। ভালবাসিলে কি হয়, বুঝিয়াছি। আমি সব দিয়াছি, সত্য বলিতেছি, আমি হৃদয়ের সব ঢালিয়াছি, বৃথা শূন্যের দিকে আর তাকাইও না। যে প্রেমসিন্ধুতে সকলের প্রীতি, সকলের ভক্তি বিমিশ্রিত, সেই সিন্ধুর দিকে এখন নয়ন ফিরাও। আর বৃথা মজিও না। বৃথা হলাহল পান করিও না। অনন্তে সান্তকে ডুবাইয়া নির্লোভী, নিস্পৃহ, নিষ্কর্ম্মা যোগী হও। ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিবে, অনন্তের আস্বাদন পাইবে। সান্তে,—সাকারে,—এ ভবপুরে তাহা পাইবে না। আলোকের অতীত ধামে, রূপের অতীত নামে একবার আসক্ত হও, আমি যাহা বলিতেছি, বুঝিবে। আর, যশ মান, দর্শন বিজ্ঞান চাও, সংসারের বাজারে অন্বেষণ কর। ভক্তির শ্রীঅঙ্গন সেখান হইতে অনেক দূর।

আমার মা।

"কাজ কি আমার গয়াকাশী,
মায়ের চরণতলে দিবানিশি।"

লোকে বলে, আমার মা নাই। শৈশবে যিনি পালয়িত্রী, বাল্যে যিনি আশ্রয়দায়িনী, লোকে বলে যৌবনের প্রারম্ভে আমার সেই মধুরভাষিণী, আনন্দদায়িনী, কল্যাণপ্রদায়িনী মা অন্তর্হিতা হইয়াছেন। এ কথা শুনিলে আমার প্রাণ অস্থির হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চতুর্দ্দিক শূন্য দেখি। মা নাই, ছেলে আছে?—তিনি নাই, আমি আছি?—কি মর্ম্মভেদী কথা। শুনিলেই চক্ষু হইতে জল পড়ে! সত্যই কি আমার মা নাই?

মা কবিত্বের খনি। একবার প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাক, রোগ শোক, দুঃখ যন্ত্রণা, বিপদ আপদ—সব চলিয়া যাইবে। এমন মধুর শান্তিমাখা নাম আর নাই। এমন আরামের জিনিস বিধাতা সকলের পক্ষেই সুলভ করিয়া দিয়াছেন। যে জন্মিয়াছে, তারই মা আছে। মা অন্যের নিকট অপরাধিনী হইতে পারেন, কিন্তু সন্তানের নিকট সব মা-ই দেবী। মাতৃভূমি—দেবভূমি। মায়ের কোল, দেবকোল। ঐ কোলে—পৃথিবীর প্রলোভন-অশান্তি, পাপ-দস্যু, সংসার-বিপদ,—কিছুই নাই! মায়ের মুখ সন্তানের নিকট যেমন মিষ্ট, যেমন মধুর, এমন আর কি কিছু আছে? ছেলে কাঁদিতেছে, খুব কাঁদিতেছে। মা ছেলেকে শাসন করিতেছেন, প্রহার করিতেছেন—ছেলে আরও কাঁদিতেছে। তুমি ছেলেকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে চাও, ছেলে কিছুতেই তাতে সম্মত হইবে না,—সে আরো কাঁদিবে, সে আরো মায়ের কাছে ঘেসিবে। মা ছেলেকে মারিলেও ছেলে মাকেই চায়; মা ছাড়া হইয়া থাকিতে চায় না! হাজার মারিলেও ছেলে মা মা বলিয়াই কাঁদে। মা ছেলের যেন সব—তার যেন মা ছাড়া আর কিছুই আপনার নাই। জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সে আপনার মাকে চিনিয়াছে, তা নয়। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাব্য-কারখানায় মাতৃ-গুণের অস্ফুট ব্যাখ্যা অভ্যস্থ করিয়া এত মাতৃভক্ত হয় নাই। সে জন্মিয়াই মাতৃভক্ত। মাতৃভক্তি তার সহজাত জিনিস, স্বোপার্জ্জিত নয়। "শিশু মূর্খ, অজ্ঞান, জড়পিণ্ডবৎ," তুমি শিশুর এইরূপ যে ব্যাখ্যা করিতে চাও, কর, কিন্তু তুমি যত বড় পণ্ডিতই হও না কেন, তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, শিশুর ন্যায় মাতৃভক্ত আর কেহই নাই। শিশুর নিকট—মা ভিন্ন এই ধরা যেন শরার ন্যায়! মা-শূন্য তোমার ধন-জন-পূর্ণ বিশ্বসংসার তার নিকট শ্মশান! মায়ের তিরোধানে শিশুর জীবন ধারণ অসম্ভব। মা যেখানে, শিশুও সেখানে। মা যখন শ্মশানের চিতায় ভস্মীভূতা, কিছুদিন পরে, শিশুকেও সেই চিতার ভস্মকণায় দেখিতে পাইবে। মা নাই অথচ ছেলে আছে, একথা জগতে বড়ই নূতন কথা। মাতৃহীন কচি ছেলেকে সহস্র জ্ঞান বিজ্ঞান মিলিত হইয়াও বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। মাতৃস্তনের একবিন্দু অমৃতে শিশুর জীবন ধারণের যে কল কৌশল বিদ্যমান, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী তপস্যারও আজ পর্য্যন্ত সে কৌশল আবিষ্কার করিতে পারে নাই। এই জন্যই ত ছেলে মা ছাড়া থাকে না; সে যেন

জানে যে, মা ভিন্ন তাকে আর কেহ বাঁচাইতে বা রাখিতে পারিবে না। দেখ, শিশুর জ্ঞান কত দূরদর্শী!!

মাতৃশ্রাদ্ধ নামে মাতৃহীন পুত্রের বাজারে একটা কথা শুনা যায়। কথাটা শুনিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিনা। এ সকলই বাহিরের ব্যাপার; পূজা অর্চনা—সব বাহিরের কাণ্ড। মা নাই অথচ ছেলে আছে, ছেলে আয়োজন করিয়া, ঘোর ঘটা করিয়া মাতার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য কথা! যিনি দেহ, প্রাণ, মন, জীবন সমস্তই; তাঁকে আর কি দিতে পারি? তিনি ত আমার শরীরের অণু পরমাণুতে ও রক্ত বিন্দুতে বিন্দুতে অনুপ্রবিষ্ট—তাঁর কি তিরোধান সম্ভবে? সম্ভব হইলে বাঁচিব কি লইয়া? বাঁচা কি সম্ভব? তাঁর স্মৃতি, চির-স্মৃতি; তার রূপ—আত্মাময়;—তার প্রকৃতি আমার জীবনময়। মায়ের রূপ, মায়ের গুণ, মায়ের স্বভাব পায় নাই, এমন ছেলে পৃথিবীতে কি আছে? মায়ের গর্ভ হইতে যে অবতীর্ণ, সে-ই মাতৃস্বভাব প্রাপ্ত। মা ও সে, একাত্মক। মা ও ছেলে—অভিন্নাত্মক। যেখানে ছেলে, সেই খানেই মা। তিরোধান নাই, অন্তর্দ্ধান অসম্ভব। মাতার প্রকৃতি যে ছেলে পায় নাই, সে পৃথিবীর পশু-শ্রেণীভুক্ত। সন্তানের আদর এই জন্য যে, সে মাতৃপ্রকৃতিক। পার্কার ও ম্যাট্সিনি, গারফিল্ড ও খ্রীষ্ট—মাতৃপ্রকৃতি পাইয়াই জগতে চির-আদৃত। তুমি আমি, সকলেই মায়ের রক্তে সঞ্জীবিত। মা—আমার সর্ব্বাঙ্গের অণুতে অণুতে। ঐ স্মৃতি, ঐ মধুর প্রকৃতি ভুলিবার নয়, মাতৃঋণ কিছুতেই পরিশোধ করা যায় না। শ্রদ্ধা—বাহিরের বস্তুর প্রতি অর্পণ করা সম্ভব। আপনার প্রাণের বস্তুর প্রতি আর শ্রদ্ধা কি? "তিনি—আমার,"—ইহাতেই আমার সব পূজা শেষ। তিনি ছাড়া আমি থাকিতে পারি না, এই কথাতেই সব ভক্তির অবসান। তাঁর গুণ আমি গাহিতে পারি না—তাঁর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না, এই ধারণাতেই সেই নিগূঢ় প্রেম অভিব্যক্ত। যে সেই অতল-স্পর্শ প্রেমের ঋণ শোধ দিতে যায়, যে সেই অব্যক্ত, অশেষ প্রেমের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে সেই মাতৃভক্তির কিছুই মর্ম্ম জানে না। শিশু, শ্রদ্ধা, ভক্তি, কিছুই জানে না। সে জানে কেবল—মা। শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, এ সকল ব্যবসাদারীর বচন শিশুর কণ্ঠে নাই;—সে মায়ের চখের প্রতি চাহিতে জানে, আর মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া হাসিতে জানে। ইহাতেই তার কাব্য-দর্শন-বিজ্ঞান শেষ। "আরাধনা" করিয়া সে মায়ের

স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে চায় না, সে মায়ের স্বরূপ জানেও না। যার মা-ই সব, সে আর কিসের তুলনায় তাঁর ব্যাখ্যা করিবে। ভাবা, তুলনার জিনিস,—তুলনায় ফুটে, তুলনায় উঠে। মায়ের তুলনা কার সঙ্গে সে করিবে? সুতরাং এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নীরব। তার কচি মুখের নীরব আধ-ফোটা হাসিতে যে মাতৃভক্তি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত, তার নীরব ভাষাতে যে আত্মনির্ভর অভিব্যক্ত, তার আর তুলনা নাই। তাহা অতুল। সে নিত্যানন্দ ধাম। মা ও ছেলের সম্মিলন—বৈকুণ্ঠ ধাম—কৈবল্যধাম। তার ব্যাখ্যা নাই—তার টীকা নাই, তার ভাষা নাই।

আমার মা নাই, যে বলে, সে আমার মায়ের প্রকৃতি জানে না। মা আমার প্রকৃতির অন্তরালে সদা লুক্কায়িত। আমি আছি যতদিন, ততদিন মা আমার সঙ্গেই আছেন। আমি কোন্ মায়ের কথা বলিতেছি? জড়-দেহধারিণী মা ও চিন্ময়ী মা, উভয়ের কথাই বলিতেছি। মা—দুই জন নাই। মা—এক আদ্যাশক্তি। এক অনন্ত আদ্যাশক্তির বিকাশ বা প্রকাশ—সসীম জড় দেহধারী মা। মা-প্রকৃতি—অনন্ত-সুখ-প্রস্রবণ। বাল্যকালে কলিকাতায় আসিবার সময়ে যিনি দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া, সলজ্জভাবে, সস্নেহ মিষ্ট দৃষ্টি-জালে আমাকে বাঁধিতেন, মুখের অমিয়া ও সুধা বর্ষণ করিয়া যিনি নীরব ভাষায় আমার মঙ্গল কামনা করিতেন—অবিরল চক্ষের জলে যার হৃদয়স্থিত অনন্ত প্রেমসিন্ধুর পরিচয় পাওয়া যাইত, ধীরে ধীরে কোমল হস্ত মস্তকে স্থাপন করিয়া যিনি সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা অপহৃত করিতেন,—সেই মধুর হইতেও মধুর, সেই সুখ-প্রস্রবণ, সেই আনন্দের লীলাস্থল, সেই শান্তির নিকেতন, সেই প্রাণ জুড়ানের একমাত্র অচ্যুত মাতৃ-ক্রোড় শূন্য হইয়া আমি রহিয়াছি? যে বলে, সে অজ্ঞান। আমি মায়ের পূজা জানি না, আমি তাঁর প্রেমের ঋণ শোধ দেই নাই, আমি তাঁর সেবা করি নাই, এ সব কথা সত্য। কিন্তু আমার কাছে তিনি নাই,—অথবা আমি তাঁর প্রকৃতি পাই নাই;—এ সব মিথ্যা কথা। "মা" বলিলেই আমার মাকে বুঝায়। "আমি" ও "মা"—বিমিশ্রিত কথা। তিনি সদা আমার কাছে,—তাঁর স্নেহে আমি সদা প্রতিপালিত, তাঁর স্বরূপে, তাঁর প্রকৃতিতে সদা নিমজ্জিত অথবা বিজড়িত। তিনি ও আমি—একাত্মক। অথবা আমি কে, আমি কোথায়? বিম্ব, প্রতিবিম্ব, বহুত্ব যে মায়ে, সে যাকে চিনে নাই। মায়ের প্রকৃতিতেই মানুষ গঠিত। বাইবেল কোরাণ সব মিলিয়া

এই কথাই বলে যে, মানুষ মায়ের প্রকৃতিতে গঠিত। অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে যে এক নিত্য বস্তুর পরিচয় পায় নাই, সে বৃথাই মস্তিষ্ক ঘুরাইয়া জড় ঘাটিয়া তর্কবিতর্ক করিয়া মরিতেছে; একমেবাদ্বিতীয়মের মহিমা সে বুঝে নাই, অদ্বৈত শাস্ত্রের গভীরতার মর্মভেদ সে করিতে পারে নাই। সে মনে করে, আমি আপনি উদ্ভূত হইয়াছি, মা ছাড়া জগতে আসিয়াছি! অহো দুর্ব্বুদ্ধি, তোর কত লীলা। তিনি ভিন্ন, সেই মা ভিন্ন কাহারও অস্তিত্বের সম্ভাবনা ছিল না। যে তিনি জড় দেহ ধারণ করিয়া আমাকে স্তন্যামৃত দ্বারা লালন পালন করিয়াছেন, সেই তিনিই আজ চতুর্দ্দিকে অনন্ত প্রকৃতি-রূপ ধরিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি তোমাতেও, তিনি আমা-তেও। তোমাতে আমাতে যে মিল, তার কারণ তাঁর অস্তিত্ব। ভ্রাতৃমিলন—মা রূপ কারণ-সম্ভূত। তুমি যে আমার সাহায্য কর, সে তোমার ইচ্ছা নয়, সে তাঁরই ইচ্ছা। তুমি আমিই বা কে? তাঁর শক্তি, তাঁর জ্ঞান, তাঁর কৃপার পরমাণু ভিন্ন আমরা আর কিছুই নই। কিসের অহঙ্কার, কিসের বা অভি-মান,—সব তাঁর! ভাল থাকি যখন তখনও মায়ের, অপরাধী যখন তখনও মায়ের। তিনি শত প্রহারে মারিলেও আমি তাঁর। তাঁর জিনিস তাঁকে আর কি দিব, দিতে কি পারি? তিনি গ্রহণ না করিলে মানুষের সাধ্য কি আত্মোৎসর্গ করে? মজাইতে তিনিই পারেন, ডুবাইতে বা আত্ম-ভুলাইতে তিনিই জানেন। আর কেহ জানে না;—এখানে কোন গুরু, কোন নেতা বা কোন পথপ্রদর্শক নাই। তিনি, তিনি—কেবল তিনি;—জন্মদিনে তিনি, আজও তিনি, মৃত্যুর গভীর অন্ধকারময় স্থানেও তিনি, কল্পনার অতীত দেবধাম স্বর্গেও তিনি। মা ছাড়া—ছেলে এক মুহূর্ত্ত থাকে না, থাকিতে পারে না। পৃথিবী শুন, যতদিন আমি আছি, ততদিন আমার মাও সঙ্গে আছেন। একেলা পাইয়া, সংসার, তুমি ভ্রুকুটী দেখাইতেছ? জান না যে, আমি মায়ের ছেলে। আমার তুলনায় নাকি জগতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং আমার পর তিনি থাকিবেন কি না, আমি তাহা জানি না। আমি কেবল এই জানি, তিনি আমার। তিনি আমার চক্ষের জ্যোতি, তিনি আমার হাতের কাজ। তিনি আমার মাথার মণি, তিনি আমার হৃদয়ের প্রেম। যিনি আমার সব, তাঁর আর ব্যাখ্যা কি করিব? আমি অক্ষম। আমি তাহা পারি না। আমি কেবল এই জানি—আমার মা, আমার সঙ্গে চিরকাল। আমি কেবল মা ডাকে সিদ্ধ। পূজা অর্চ্চনা,

যোগ তপস্যা, আমি ওসব বাহিরের ব্যাপার কিছুই জানি না। আমি কেবল জানি "মা।" "মা"ই আমার পূজা, মা-ই তপস্যা, মা-ই সিদ্ধি, মা-ই ভক্তি, মা-ই আমার মুক্তি, মা-ই আমার বৈকুণ্ঠ। মাতৃধামই আমার একমাত্র লক্ষ্য, গন্তব্য বা বিহার স্থান,—এখন এবং চিরকাল। সেই মঙ্গল ধাম ভিন্ন আমি আর কিছুই চাই না। চিরকাল কেবল মাকেই চাই, ভক্তি বিশ্বাস, জ্ঞান সেবা আমি কিছুই জানি না, কিছুই চাই না;—আমি কেবল অচ্যুত 'মাতৃ'-ধামে, মাতৃপ্রকৃতি লইয়া বসিয়া থাকিতে চাই, আর মা মা বলিয়া ডাকিতে চাই। আমার মা নাই, দোহাই বন্ধু, একথা মুখেও আনিও না। মা আছেন বলিয়াই আমি আছি। মাকে নমস্কার করি, মা এখনকার মত আমার চিরসহায় থাকুন।

প্রেমের দায়, না কর্ত্তব্যের টান্?

মানুষের দুর্ব্যবহার দেখিলে, আর মানুষের ধারে যাইতে ইচ্ছা হয় না। মানুষকে ভালবাসা, মানুষের স্বভাব। বিধাতার কি এক গুপ্তলিপি মানুষের মুখে প্রতিভাত, তাহার আকর্ষণবলে মানুষ মানুষের ধারে যাইতে বাধ্য। এই জগৎ প্রেমের লীলাভূমি। মানুষ, মানুষকে ভালবাসিবে—প্রতি মানুষের ভিতরে বিধাতার প্রদত্ত যে বিশেষত্ব বিদ্যমান, তাহা গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইবে, ইহাই যেন বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা। নচেৎ মানুষকে দেখিয়া, মানুষ কখনও ভুলিত না। মানুষ, মানুষের ভিতরের ও বাহিরের দুর্ব্যবহার দেখিয়া ত্যক্ত বিরক্ত হইতেছে, তবুও মানুষের কাছে অবিরত ছুটিতেছে। বিধাতার লীলা এইরূপ, কিন্তু তবুও পৃথিবীতে প্রেম-খেলার ঘর ভাঙ্গিতেছে,—স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ, পিতা পুত্রের বিচ্ছেদ,—ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ও বন্ধু-বিচ্ছেদে জগৎ অস্থির। আপন বলিয়া মানুষকে ধরি, কোল দেই, শরীরের রক্ত জল করিয়া উপকার করি, মানুষ তবুও বুকে ছুরি মারে! হা, জগৎ, এ কি চিত্র!! যে যার যত উপকার করিতেছে, সে যেন তার তত শত্রু। সম্প্রদায়গত বিবাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, এই শস্য-শ্যামলা পৃথিবী, নানাবিধ ঝগড়া বিবাদের লীলাক্ষেত্র।—দিন দিন বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। হায়, মানুষ চায় বা কি, পায় বা কি? শুনিয়াছি, এক দিন প্রাতঃস্মরণীয়, বঙ্গের উজ্জ্বলতম রত্ন মহাত্মা বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের নিকট এক জন লোক উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, অমুক লোক আপনার নিন্দা করিয়াছে এবং আপনার অনিষ্ট চেষ্টায় রত আছে।"

এই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে চিন্তা করিলেন, এবং তার পর বলিলেন—"সে ব্যক্তির আমি কখনও কোন উপকার করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না—তবে কেন সে আমার নিন্দা করিবে বা অনিষ্ট চেষ্টা করিবে?"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কথার অর্থ এইরূপ যে, যে মানুষের উপকার করিবে, সে-ই তোমার নিন্দা ঘোষণা ও অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে! উপকারীর প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞচিত্ত হইয়া থাকার পরিবর্ত্তে অনিষ্ট-চেষ্টা! এ কথা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। দেখিয়া শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধারণা হইয়াছিল, এদেশ অকৃতজ্ঞতারূপ মহা কলঙ্ক-সাগরে যখন নিমগ্ন হইয়াছে, তখন এদেশের আর নিস্তার নাই। তিনি শেষজীবনে সকল প্রকার উন্নতি সম্বন্ধেই সংশয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও অকাতরে দুঃখী দরিদ্রকে দান করিতেন, বহু বিধবার ভরণপোষণ করিতেন, অসহায়া রমণীর কথা শুনিলে অশ্রুতে ভাসিতেন! এ এক কি অপরূপ ব্যাপার!! ইহা কি প্রেমের দায়, না কর্ত্তব্যের টান?

মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বা প্রতিনিধি স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্র বিশেষে উল্লিখিত হইয়াছে। মানুষের সৎগুণ রাশির বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিকই মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি-স্বরূপ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানুষের হিংসা বিদ্বেষ—স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার, উপকারীর প্রতি শত্রুতাচরণ, শত্রুর প্রতি জাতক্রোধ, অন্য ধর্ম্মমতাবলম্বীর প্রতি ঘৃণা—পরের প্রতি অনিষ্ট আচরণ,—প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি নানা দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ হইলে মানুষকে পশু অপেক্ষাও হেয় বলিয়া বোধ হয়। ঘোরতর কপটতার আবরণে আচ্ছাদিত মানুষ, দিবা রাত্রি, মানুষকে ঠকাইতেছে, মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িতেছে! মানুষকে অবিশ্বাস করাও মহাপাপ—কিন্তু যেরূপ পৃথিবীর গতি, মানুষকে বিশ্বাস করাও দায়। মানুষ বারবার প্রতারিত হইয়াও আবার মানুষের কাছেই যায়। ইহা কি প্রেমের দায়, না কর্ত্তব্যের টান?

মানুষ আর যাইবেই বা কোথায়? মানুষ ছাড়িয়া, মানুষ কোথায়

দাঁড়াইবে ? নানা বিঘ্ন-পরিপূর্ণ এই সংসারে বাস করিতে হইলে এক দিকে যেমন বন্ধুর সাহায্যের প্রয়োজন, পুণ্য এবং পবিত্র ধর্ম্মরাজ্যে যাইতে হইলেও, সেইরূপ, অভিন্নহৃদয় সুহৃদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু জুডাস ইস্কেরিয়টের ন্যায় বন্ধুর অনিষ্ট সাধনে রত নয়, এমন লোক পৃথিবীতে কিছু দুর্লভ। প্রকৃত বন্ধুত্ব, এই স্বার্থপূর্ণ পৃথিবীতে আকাশ-কুসুম। মানুষ বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও আবার বিষ-পান করিয়াই দিবানিশি মজিতেছে। ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পারে না। এ এক বিষম মোহ, এ এক ভয়ানক প্রলোভন! জলিয়া পুড়িয়া মরিবার জন্যই বুঝি বিধাতার এই সৃষ্টি!

ভালবাসা—স্বর্গের কুসুম; ভালবাসা—নরকের ঢেউ।। যে সৌন্দর্য্য মানুষকে স্বর্গে লইবার জন্য, সেই সৌন্দর্য্য অপর দিকে মানুষকে নরকে ডুবাইবার জন্য! রূপ দেখিয়া মানুষ বিধাতার মজে, রূপে মজিয়া মানুষ নরকের আশ্রয় লয়। যার মন যেমন, তার ভাগ্যে তাই। ভালবাসা সৃষ্টির অতি মধুর জিনিস;—এমন জিনিস আর সৃষ্টিতে আছে কি না, জানি না। কিন্তু অপর দিকে যত অনর্থের মূল, এই ভালবাসা। ভালবাসার খাতিরে মানুষ ধর্ম্ম ডুবায়, কুল ত্যজে, চরিত্র হারায়, নরহত্যা করে;—কি না করে, আমি জানি না। ভালবাসার খাতিরে পৃথিবী নরশোণিত-পাতে পূর্ণ। ভালবাসা না করিতে পারে, এমন অপকর্ম্ম নাই। ব্যভিচারী, কুলটা, স্বৈরিণী, এ সকল অপবাদই ভালবাসার খাতিরে। এক মানুষের বুকে অপর মানুষ অন্তের ভালবাসার খাতিরে ছুরি মারে! স্বর্গ আর নরক—এক বস্তুতে!

পৃথিবীর সকল জিনিসেরই দুটি দিক্ আছে;—একটা ভাল, একটা মন্দ। মানুষ দেবতা, মানুষ পশু। এমন ভাল জিনিস নাই, যাহার মন্দ নাই। এমন যে পবিত্র সৃষ্টি—ফুল, তাহারও দুই দিক্ আছে। এমন যে সুমিষ্ট কোকিলের স্বর—তাহারও দুই দিক্। এমন যে রমণীর সৌন্দর্য্য—তাহারও দুই দিক্। ফুল, কোকিলের স্বর, রমণীর রূপ—কাহাকেও স্বর্গে তুলিতে, কাহাকেও নরকে লইয়া যাইতে। তুমি বলিবে, যার মন কলুষিত, সেই এই সকলের দ্বারায় নরকে যায়। কথা ঠিক্ বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ ত,—কত মানুষের মন কলুষিত?—কত লোক মজিতেছে—কত লোক ডুবিতেছে? পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ কর, বুঝিবে, ভাললোক পৃথিবীতে দুর্লভ। তবে কি ফুল ফুটিবে না, পাখী গাইবে না, রমণী বেড়াইবে না? কুমিইত

বল, "রমণী সর্ব্বনাশের মূল,—বেশ্যা সংশ্লিষ্ট থিয়েটার নরকের পথ।" তোমার মন কলুষিত বলিয়া কি এ কথা বলিতেছ না? বেশ্যাও যাঁহার সৃষ্টি, তুমিও তাঁহারই সৃষ্টি। বেশ্যা অপরাধিনী, আর তুমি কি কাজে, কি চিন্তায়, কোনরূপেই অপরাধী নও? তুমি অপরাধী ভাই, তোমার ভগ্নীকে, বিধাতার কন্যাকে অপরাধিনী মনে করিয়া ঘৃণা করিতেছ? তাহাকে তোমার সমাজ বা তুমি যে ডুবাইয়াছ, তাহা ত একবারও ভাবিলে না! এদিকে তুমিই ধার্ম্মিকতার ভাণ করিয়া বেড়াও? ধিক্, তোমার ধর্ম্মে। তোমার মন যে কলুষিত, সে কথাটা নিজের সম্বন্ধে বলিলে না; অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিলে। তবেই দেখ, ভাল মন্দ সর্ব্বত্রই কি না। তুমি, আমি, সে,—কে ভাল, কে মন্দ, এ বিচার না করিয়া, বিচার কর না কেন, "আমি মন্দ, সে-ই ভাল! —আমারই যত দোষ, তার দোষ নাই।" হায়, তাহা হইলে এই হতভাগ্য পৃথিবী আজ সোণার পৃথিবী হইত। তোমাকে কে কি বলিয়া গালাগালি দিয়াছে, তুমি তাই ভাবিয়াই অস্থির। তোমায় কে কবে নিন্দা করিয়াছে, সেই চিন্তাতেই তুমি বিভোর। তোমার ধর্ম্মকে কে কবে তুচ্ছ করিয়াছে, তাহা লইয়াই তুমি ব্যস্ত। হায়, একবারও তার গুণ ভাবিলে না? ভাবিলে না—তোমার দোষ আছে বলিয়াই সে গালি দিয়াছে, অথবা গালি দিয়া ত সে বন্ধুর কাজই করিয়াছে। মহাজনেরা বলেন, যে দোষ দেখায়, সে-ই বন্ধুর কাজ করে। তোমার দোষ না থাকে, তাতেই বা তোমার ক্রোধের বিষয় কি? কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দেও না কেন? যে গালাগালি দিয়াছে, নয় তাকে ক্ষমাই কর। তুমি তার পরিবর্ত্তে তার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ-পিণ্ড চট্‌কাইয়া সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছ; এ যে তোমার কি অভিনব ধর্ম্ম-প্রচারের ধুয়া, আমি তাহা কিছুতেই বুঝিলাম না। তোমার ঐ অহঙ্কার-মূলক (Moral-indignation) নীতি-ঘৃণাটাকে (?) কর্ম্মনাশার জলে কিছুতেই ফেলিতে পারিলে না, অথচ ধর্ম্মের বড়াই কর। আমার ধারণা ছিল, যে ধার্ম্মিক, সে বুঝি নিন্দা বা গালাগালিতে টলে না—সে বুঝি এ সকলের অতীত। সে বুঝি পুণ্যভূমিতে পাদচারণা করে। অহো দুর্ভাগ্য, আজ দেখিতেছি, ধার্ম্মিকের ক্রোধ ও হিংসা আরো বেশী। ভাল মন্দ যে সর্ব্বত্রই বিজড়িত, বিমিশ্রিত, এ কথাতে আর সন্দেহ রাখিতে পারিতেছি না।

আমি যতই সূক্ষ্মরূপে জগতকে পরীক্ষা করিতেছি, ততই দেখিতেছি,

সকল বস্তুই এখন মন্দের দিকে অধিক ঝুকিয়া পড়িয়াছে। মানুষ এখন পশুত্বে চলিয়াছে,—ধার্ম্মিক যাহারা, তাহারাই এখন অধিক অধার্ম্মিক। মানুষের সৎগুণ রাশি এখন মহা পাপ-রাহু গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সত্য, পুণ্য, নীতি, ধর্ম্ম, চরিত্র হুজুগপ্রিয় কলিযুগে অন্তর্হিত হইয়াছে। কপটতা, প্রবঞ্চনা—এখন মানুষের ব্যবসা। সে-ই বড়, যে মানুষকে অধিক ঠকাইতে পারে। অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না—এখন ভারতবর্ষ পশুর লীলাচল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যভিচারের স্রোতে, ভ্রূণ-হত্যার স্রোতে, হিংসা বিদ্বেষের স্রোতে ভারত প্লাবিত। যে দিকে চাই, দেখি, আমরা রাশি রাশি পশু এই ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেছি! কে কাকে দেখে, কে কাকে ধরে, স্বার্থ স্বার্থ করিয়া সকলে অস্থির!!

বাল্যকাল হইতে কত লোককে আপনার বলিয়া বুকে ধরিয়াছি, প্রাণে ছুরি মারে নাই, এমন বন্ধু বিরল। জীবন দিয়া জীবন পাইবার চেষ্টা করিয়াছি; তার বিনিময়ে পাইয়াছি—ছাই। যাহাদিগের উপকার করিয়াছি—দেখিয়াছি, তাহারাই কিছুদিন পর প্রধান শত্রু। সমাজ সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি—পাইয়াছি, লোকের গালাগালি। দেখিয়া শুনিয়া, এখন সাধ হইয়াছে—চুপ করিয়া বসি। তোমার মধুর বন্ধুত্ব চাই না, তোমার ঐ মন-ভুলানো ভালবাসা চাই না, আড়ম্বরময় দেশ-সংস্কার চাই না—চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চাই। কিন্তু কেমন যে বিষম মোহের ঘোর,—লোক কাঁদিতেছে, শুনিলেই প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। যে শতবার বক্ষে আঘাত করিয়াছে, সে দ্বারে আসিলে আবার তাকে বুকে না তুলিয়া থাকিতে পারি না। যে শতবার ঠকাইয়াছে, আবার কাঁদিয়া অভাব জানাইলে তাকেও কিছু না দিয়া থাকিতে পারি না। আমি কি এক বিষম মোহে পড়িয়াছি, ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইতেছি। হিন্দুসমাজ বল, ব্রাহ্মসমাজ বল; ধনী বন্ধু বল, দরিদ্র বন্ধু বল;—সকলের ব্যবহার দেখিয়াই অবাক্ হইয়াছি! আমিও তাদেরই এক জন। তারাও আমার ব্যবহার দেখিয়া নাকি অবাক হইয়াছে। আমিও নাকি তাদের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! ইচ্ছা লইয়া কথা নয়; ইচ্ছা, মানুষ দেখে না—সুতরাং বন্ধুরাও যে আমাকে "অধঃপতিত" ভাবিয়া অশ্রুবর্ষণ করিবেন, আশ্চর্য্য কি? অশ্রুবর্ষণের সহিত তাঁহারা অনিষ্ট চেষ্টাও করিতেছেন,—মহত্বের কত পরিচয় দিতেছেন! আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি—আর অবাক হইতেছি।

কোথাও যাইব না, ভাবি। ভাবিতে না ভাবিতে দেখি, অন্যত্র যাইয়া উপস্থিত হইয়াছি। কাহাকেও আপনার ভাবিব না, মনে ভাবি,—দেখি, ভাবিবার পূর্ব্বেই অন্তকে আপনার ভাবিয়া বসিয়াছি। ঠকিয়া, প্রতারিত হইয়া কত বার অন্তের তিরস্কার শুনিয়াছি—কিন্তু যত বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তত বারই অধিক ঠকিয়াছি। ঠকিয়া ঠকিয়া জেরবার হইয়া ভাবিতেছি—এ প্রেমের দায়—না কর্ত্তব্যের টান?

প্রেমের দায়ও না, কর্ত্তব্যের টানও না। এ এক মহাজনের মহা খেলা। ঋণ শোধ দিতে আসিয়াছি,আজীবন ঋণই শোধ দিতে হইবে। জীবন দিলেও ঋণের শেষ নাই। আছি ইহারই জন্ম—মরণের দেশে যাইব, ইহারই জন্ম। আশা, ভরসা, প্রত্যাশা, সব বিসর্জ্জিত হইয়াছে—এখন ভবের তীরে বসিয়া জীবনের ভাটী বেলায় ঋণ শোধিতে বসিয়াছি। মানুষের কাছে কত ঋণী ছিলাম, হিসাব কেতাব কিছুই নাই। যত শোধিতেছি, তত লোক ছুটিয়া আমার নিকট আসিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন আমার দিকে ছুটিতেছে। আমার ক্ষুদ্র বুকে সকলকে পুরিতে পারিতেছি না—তাই কেহ যাইতেছে, কেহ আসিতেছে। যে দিন আমার ঋণ শোধ হইবে, সেই দিন আমি মহাযাত্রা করিব। সেই দিন সকলে আমার সপিণ্ডীকরণ করিও।

লীলা-চাতুর্য্য। *

নববর্ষের প্রারম্ভে সর্ব্বাগ্রে বিধাতাকে প্রণাম করিতেছি। তিনিই নেতা, তিনিই বল, তিনিই বুদ্ধি, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহার কৃপাতেই আছি, তাঁহার কৃপা হইলেই যাইব! তিনি আমাদিগের সকল অবস্থার একমাত্র রক্ষক। তিনি আমাদিগের উপর করুণা বর্ষণ করুন।

তৎপরে আমাদিগের বন্ধুদিগকে প্রণাম করিতেছি। এই কঠোর সংসার পরীক্ষায় তাঁহাদিগের যত্ন, উৎসাহ, সাহায্য, এবং সহানুভূতি বিনা কখনই আমরা তিষ্ঠিতে পারিতাম না। সকলে আজ আমাদের ত্রুটি ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রসন্ন চিত্তে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

* ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাসে লিখিত।

তৎপরে, যাঁহারা আমাদিগের প্রতি বিরক্ত, যাঁহারা আমাদিগের উন্নতিতে কাতর, যাঁহারা আমাদিগের অনিষ্ট সাধনে ব্রতী, তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিতেছি। ভবের মেলা, ভবের খেলা দুদিনের,—আজ আছে, কাল নাই। ইহার জন্য দ্বেষ বিদ্বেষ কেন? আমরা খুব নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা আমাদের উপকারী ভাই। তাঁহারা না থাকিলে আমাদের দোষ ত্রুটি আমরা বুঝিতে পারিতাম না। আজ নববর্ষারম্ভে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাদিগের চরণেও প্রণাম করিতেছি। সম্পদ, বিপদ ও সুখ দুঃখের তীব্র উত্তেজনায় আমরা বুঝিয়াছি, এ জগতে বন্ধুও কেহ নাই, শত্রুও কেহ নাই; অথবা বন্ধু যিনি, সময়ে তিনিই শত্রু, আবার শত্রু যিনি, সময়ান্তরে তিনিই বন্ধু। যার যখন যে কাজ, সেই কাজই তিনি সম্পন্ন করেন। প্রয়োজনানুসারে কেহ বন্ধু, আবার কেহ শত্রু। বন্ধুরও কাজ আছে, শত্রুরও কাজ আছে। দুইয়ের মধ্যে কে অধিক উপকারী, আমরা জানি না। আমরা এই মাত্র জানি, বিধাতার ইচ্ছাতেই এ দুয়ের উদ্ভব, সুতরাং এ দুই-ই উপকারী। আমরা লীলাময় হরির লীলা না বুঝিয়া, অনেক সময়ে বৃথা বন্ধুসম্মিলনে উল্লসিত হই, নৃত্য করি,—না বুঝিয়া সময়ান্তরে শত্রুর ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া হাহাকার করি, নিরাশায় অবসন্ন হই। বিধাতার লীলা-প্রহেলিকার অন্তর-স্তর ভেদ করে, কার সাধ্য?

সোজা কথায়, বন্ধু কে? না, যে আমায় ভালবাসে, আদর করে, প্রশংসা করে, আমার মঙ্গল চায়, সুখে সুখ এবং আমার দুঃখে দুঃখ জ্ঞান করে। সোজা কথায়, শত্রু কে? না, যে আমাকে ঘৃণা করে, যে আমার নিন্দা করে, যে অনিষ্ট সাধনে তৎপর, যে আমার সুখে দুঃখী এবং দুঃখে সুখী। এই দুটী কথার দার্শনিক তত্ত্বে ভাসাভাসা চিন্তায় পরস্পর-বিরোধী-ভাব সংলগ্ন আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে আর সে ভাব থাকে না। কেন, বলিতেছি।

যে ব্যক্তি আদর করে, প্রশংসা করে, ভালবাসে, সে আমার নিকট বড়ই মিষ্ট। মনুষ্যের মধ্যে যত অপকৃষ্ট বৃত্তি বা রিপু আছে, তাহার মধ্যে অন্যের প্রশংসা বা ভালবাসা-লালসা তন্মধ্যে একটী প্রধান। অন্যের প্রশংসা বা অন্যের ভালবাসা লইবার জন্য এই জগৎ পাগল। মানুষ মানুষের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করে, ভালবাসার খাতিরে, মানুষ মানুষের উপকার করে, অন্যের প্রশংসা লাভের জন্য। ভালবাসা ও প্রশংসা-লালসা

যদি বিলুপ্ত হইত, মানুষ ঠিক্ প্রাণের টানে মানুষের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিতে এবং অন্যের উপকার করিতে পারিত কি না, সন্দেহ। ভালবাসা ও প্রশংসার লালসা মানুষকে এতদূর অধঃপাতে লইয়া গিয়াছে যে, এই দুই বস্তু হারাইবার ভয়ে মানুষ সৎ হইতে অসতে, ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্মে, পুণ্য হইতে পাপপথে পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হইতেছে। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সংসর্গে নরক—এটী প্রাচীন কথা। মানুষ, চতুর্দ্দিকের পরিবেষ্টিত মানব-মত সমষ্টির হস্ত হইতে সুরক্ষিত থাকিয়া, বীরের ন্যায়, অতি অল্পকাজ করিতে পারে। অনেক লোকই সংসর্গের তাড়নায় কুপথে যাইতেছে। থিওডোর পার্কার বা ম্যাট্সিনি, খ্রীষ্ট বা চৈতন্যের কথা স্বতন্ত্র, ইঁহারা জগতের মঙ্গলের জন্য মান সম্ভ্রম, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; ইঁহাদের স্বর্গীয় কথা দূরে থাকুক,—বহুলোক ভালবাসা ও প্রশংসার খাতিরে বিধাতার প্রদর্শিত সত্য ও ন্যায়ের পথ অম্লান চিত্তে পরিত্যাগ করিতেছে। দৃষ্টান্ত দেখ,—পতিতা রমণীকে সাহায্য করিলে সমাজের লোকেরা বিরক্ত হন, সুতরাং ইচ্ছা সত্বেও কেহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে না, তাহারা চির-কলঙ্কের পথে যাইতেছে। খ্রীষ্ট, পতিতা রমণীকে "Go and sin no more" বলিয়া আশ্রয় দিয়া সকলের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতেন—"I am for the sinners" "আমি পাপীদের জন্যই।" এই স্বর্গীয় আদর্শে নবজীবন প্রাপ্ত হওয়াতেই আমরা (Mary Magdalene) মেরি মেক্‌ডেলিনের ন্যায় মহিলাকে দেখিতেছি। কিন্তু এ জগতে খ্রীষ্টের ন্যায় মহাপুরুষ অতি বিরল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রেলের মেসেঞ্জার নামক পত্রিকায় পড়িতেছিলাম, ব্রাড্‌ল সাহেবকে বাল্যকালে পেকার (Mr Packer) সাহেব ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি নাস্তিকতার পথে গিয়াছিলেন। মুক্তি ফৌজের জেনেরল বুথ (General Booth) সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, "General Booth picks up from the dust of the streets, the broken wrecks of humanity and tells them—"never mind the past, there is yet hope for you, you are yet capable of worthy deeds" "জেনেরল বুথ রাস্তার ধূলি হইতে মানবশক্তির ভগ্নাবশেষ তুলিয়া বলেন, "অতীত বিষয় ভাবিও না, এখনও তোমার আশা আছে, এখনও তুমি মহৎ কাজ করিতে সমর্থ।"

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া প্রয়োজন নাই। মহৎ লোকেরা জগতের হিতের জন্ত ভালবাসা ও প্রশংসাকে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের পক্ষে সে সকল কথা খাটে না। আমরা সংসর্গের দাসানুদাস,—আমরা লোকের ভালবাসার আশায় এবং প্রশংসার খাতিরে অনেক মহৎ কার্য্য হইতে বিরত থাকি। এইত গেল মিত্রদের দিক্। অন্ত দিকে, শত্রুদের ঘৃণা বা নিন্দার ভয়ে, বা তাহারা আমাদের অনিষ্ট সাধন করিবে, এই ভয়ে, আমরা অনেক সময়ে ভাল কার্য্য হইতে বিরত থাকি। ইহার আর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। শত্রু আমার কুযশ গাইবে, বুকে ছুরি মারিবে বা শত্রু হাসিবে, ইত্যাদি কথা ভাবিয়া কত সময়ে আমরা সৎকাজ হইতে বিরত থাকি। তবেই দেখা গেল, শত্রু মিত্র উভয়ই ভাল কাজ হইতে মানুষকে বিরত রাখিতে সম পারদর্শী। এই কথায় কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, "বন্ধু যেমন বন্ধুর উপকার করেন, শত্রু তেমন করেন না"—এ কথা ঠিক্ হইতে পারে, কিন্তু শত্রু কিছুই করেন না, একথা বলা যায় না। বিপদ সম্পদ, দুঃখ সুখ,—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, ঠিক্ বলা যায় না। বিধাতার রাজ্যে সুখও ভাল, দুঃখও ভাল, সম্পদও ভাল, বিপদও ভাল। বন্ধুরা সম্পদের হেতু, সুখের প্রস্রবণ, তাঁহারা উপকারী, সন্দেহ নাই; শত্রুরা বিপদের পথ-প্রদর্শক, দুঃখের হেতু, সুতরাং তাহারাও উপকারী; কেননা বিপদ বা দুঃখ-সংগ্রাম ভিন্ন এ পৃথিবীতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মে না। আলোক আর আঁধার—এ দুইয়ের মধ্যেই বিধাতার হস্ত।

বাস্তবিক যতই বয়স বাড়িতেছে, বুঝিতেছি, এ পৃথিবীতে বন্ধুও ভাল, শত্রুও ভাল; অথবা বন্ধুর প্রশংসা বা ভালবাসার যদি প্রয়োজন থাকে, শত্রুর নিন্দা ও কুব্যবহারেরও প্রয়োজন আছে। একটা ভাল, আর একটা পরিত্যাজ্য, এরূপ কথা আর বলিতে পারিতেছি না। জীবন-সঙ্কটের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, বন্ধু পর হইয়াছেন, শত্রু আপন হইয়াছেন। বন্ধু ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, শত্রু বুকে ছুরি মারিয়া লোকাতীত পথ প্রদর্শন করিয়াছে। অথবা বন্ধুত্ব বা শত্রুত্ব—এ কেবল মতের খেলা, ভোজের বাজি ভিন্ন এ পৃথিবীতে আর কিছুই নয়; বিভিন্ন মতের উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত এ দুইটী সৃষ্ট। মতে মিলিলে লোক হয় আপন, অথবা মিত্র;—মতে না মিলিলে লোক হয় পর, অথবা শত্রু। সময়ান্তরে, মতে

না মিলিলে মিত্র হন শত্রু, আর হয় ত শত্রু হন মিত্র। পৃথিবীর সমাজ সমষ্টি, ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমষ্টি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে এই কথারই জীবন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রশংসা নামক জিনিষটা আর কিছুই নয়, কেবল মত-পরিপোষক স্বরূপ একটা মধুর সম্ভাষণ, নিন্দা—এ জগতে আর কিছুই নয়, মত বৈষম্য ঘোষণার একটা অস্ত্র। যাঁহারা এই মর্ত্ত্যলোকে বাস করিয়াও মিত্র শত্রু, প্রশংসা বা নিন্দা, অনুরাগ, বা বিরাগ, আসক্তি বা বিরক্তি—এ সকলের অতীত হইতে পারেন,তাঁহারাই সাধু অথবা তাঁহারাই দেবতা। আর সকল লোক মৃত, অসার,—পরগাছা, পাষাণের জল, চির অস্থির। তাহাদের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু স্থায়িত্ব নাই।

আমাদের জীবন এই শেষ শ্রেণীর। আমরা আছি, কিন্তু পরগাছার ন্যায় আছি, আমাদের নিজের অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব নাই। আমরা লোকের ভালবাসার কাঙ্গাল, অনুরাগে জাগি, বিরাগে মরি,—আমরা প্রশংসায় নাচি, নিন্দায় অবসন্ন হই; মিত্রের আলিঙ্গনে উল্লাসে নৃত্য করি, শত্রুর তিক্ত ব্যবহারে ঘোর নিরাশায় সমাচ্ছন্ন হই। জানি না, বুঝি না যে, ইহারা দুই-ই অপকারী, এবং দুই-ই উপকারী। এ জগতে দুয়েরই প্রয়োজন আছে। আমাদের হীন দশা ভাবিলে প্রাণ মন অস্থির হয়।

আমরা কাহার জন্য বা কিসের জন্য আছি, জানি না। এক দিন বন্ধুদের ভালবাসায় ভুলিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, আমরা বুঝি, তাঁহাদেরই সেবার জন্য আছি। এখন তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। এখন পরীক্ষায় পড়িয়া ভাবিতেছি, আমরা সেবার জন্য আছি বটে, কিন্তু কার সেবার জন্য, জানি না। কেবল এই জানি, খাটিতে জন্ম, খাটিয়া মরিব;—যাহার প্রয়োজন, এ খাটুনির ফল গ্রহণ করুক্। ফল সম্বন্ধে এখন নিরপেক্ষ হইতে সাধ। হিন্দুও বুঝি না, খ্রীষ্টানও বুঝি না, মুসলমানও বুঝি না, ব্রাহ্মও বুঝি না—আমরা সম্প্রদায়গত ভেদাভেদের উপর স্তরে দাঁড়াইয়া ক্ষীণকণ্ঠে এই কথা শত্রু মিত্র সকলকে বলিতেছি, ভাই! আমরা তোমাদের সকলের দাস। তোমাদের সকলকে প্রণাম করিতেছি, আশীর্ব্বাদ কর। আর যদি আমাদের সেবা গ্রহণের প্রয়োজন থাকে, গ্রহণ কর, নচেৎ করিও না। ভালবাসা বা ঘৃণা, প্রশংসা বা নিন্দা, এ উভয়ই এ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ভাই, এ সকল পরিত্যাগ করিয়া এখন একবার স্থির চিত্তে শান্তিপুরে বসিয়া দেখ—ভবের বাজারে কে কার, কে কদিনের? কেহ কাহারও

কোন কাজে বাধা না দিয়া, সকলে যে প্রাণের ভাই, ইহা স্মরণে রাখিয়া ভালবাসা, বিরাগ, প্রশংসা বা নিন্দার উর্দ্ধে উঠিয়া বিশ্বেশ্বরের মহিমা প্রচার করি, এবং তাঁহারই সেবায় জীবন পাত করিয়া মানব জীবনকে সার্থক করি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সাহেবীকরণ।*

মানুষ যে পথে প্রতারিত হয়, সে পথে পুনঃ পা ফেলিতে সে কিছু সশঙ্কিত। কিন্তু আশার উত্তেজনা আবারও তাহাকে সে পথে লইয়া যায়, আবারও প্রতারণায় ফেলে। এইরূপ বারম্বার প্রতারিত হইলেও মানুষ আশার কুহকে আবার ভোলে। এ ভুল—মহাভুল। কিন্তু জীবন-মমতা থাকিতে এ ভ্রমের হাত হইতে কেহই নিষ্কৃতি পায় না। আশারও বিরাম নাই, ভুলেরও কূল কিনারা নাই। মানুষ দিবানিশি ভুল বুঝিয়া, ভুলে মজিয়া, ভুলকেই আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইতেছে! আশ্চর্য্য লীলা!!

দ্যূতক্রীড়ার ছলনায় ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির রাজ্যধন সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও বুঝিলেন না, প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত। আবার পাশার দান ফেলিলেন—ক্রমে আপনাদিগকে পর্য্যন্ত বনবাসী করিলেন। মহাভারতের এই প্রহেলিকার তবুও একটা মহা অর্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমরা যে কেন বারম্বার প্রতারিত হইয়াও পুনঃ সেই পথেই পা ফেলিতেছি, নিজেরাই বুঝি না। সময়ের ফের, মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি!

নূতন বর্ষ সমাগমে আবার সকলে হালখাতা বাঁধিলেন। নিকাশপত্রে দেখা গিয়াছে, কেবল লোকসান।—কিন্তু তবুও আবার বাজার গরম হইয়া উঠিতেছে। মানুষ যত ঠকিতেছে, নূতন নূতন ভেল্কির উপায় উদ্ভাবনে ততই ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। বুঝিতেছে না যে, প্রতারণার পরিণাম প্রতারণাই. কিন্তু তবুও ইহারই আশ্রয় লইতেছে। উপহারের চোটে সাহিত্যের বাজার গরম হইয়া উঠিতেছে। গত বৎসরে যে শূন্য পাইয়াছে, সে শূন্যের জোরেই আজ আবার আশায় নব মাতোয়ারা। সংসার, বলিহারি তোর ভেল্কির কুহক!!

* ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে লিখিত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "কেন নিরাশাই বা কিসে? এদেশ যে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জাতীয় মহাসমিতির এই মহামেলার দিনে কেন আক্ষেপ কর? আশার কথা শুন, চাহিয়া দেখ, ভারত কত উন্নতির দিকে চলিয়াছে। আন্দোলনে ভারত যেন ইংরাজের কাছাকাছি হইয়াছে, আর ভাবনা কিসের?"

একদিকে যতই আশার তুরি-ভেরির শব্দ শুনিতেছি, ততই আমরা গভীর নিরাশার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। বড় আশা করিয়া মহাত্মা রিপণের প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্ব-শাসনকে আলিঙ্গন করিয়াছিলাম, আজ তাহাতেও গাঢ় নিরাশার ছবি দেখিতেছি;—প্রভুত্ব ঘোষণায়, আত্ম কলহে, নানা কূটতর্কে, ঝগড়া বিবাদে বৃথা দিন কাটিয়া যাইতেছে, এত লোক-সম্মিলনেও দেশের উন্নতি হইতেছে না। এমন যে জাতীয় মহাসমিতি, ইহাও মনোমিলনের ক্ষেত্র না হইয়া এখন মনোভঙ্গের কারণে পরিণত হইতে চলিয়াছে;—ভিক্ষানীতির ধুয়া এখন বিলাত পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে। এই অধঃপতিত জাতির আশা ভরসা ইহাতেও বড় একটা দেখিতেছি না। আমরা দুটী প্রশ্নের মীমাংসা না পাইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়াছি। পৃথিবীর জাতীয় উন্নতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছি, জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন না করিয়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত পাই নাই। ধর্ম্মের উন্নতি সাধন না করিয়াও কোন জাতি পৃথিবীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহা স্থায়ী করিতে পারিযাছে বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু ভারতে এ সকল কল্পনার স্বপ্ন বলিয়া উপেক্ষিত। আশা কোথায়?

সে দিন একখানি সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছিলাম, গত ১০ বৎসরে ইংরাজি ভাষা এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, আর আর সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপন শিষ্যের সংখ্যা দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইংরাজি ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ জাতির প্রভুত্ব পৃথিবীতে দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক ও রোমক; আধুনিক ফরাসি, মুসলমান, কি ইংরাজ, যে কোন জাতির কথাই বল না কেন, ধর্ম্ম ও ভাষার উন্নতির দিনেই এই সকল জাতির আধিপত্য দেখা যায় এবং তাহার অপকর্ষের দিনেই অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ—দিন দিনই ধর্ম্মচ্যুত, দিন দিনই জাতীয় ভাষাচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন! এখন পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, এখন পাশ্চাত্য ভাষা ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

শনৈঃ শনৈঃ এখন লোক সকল ইংরাজ-অধিকৃত হইয়া পড়িতেছেন। কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি জ্ঞানে, কি সভ্যতায়—ভারতবাসী, শিক্ষিত ভারতবাসী এখন ষোল আনা সাহেবী-কৃত। ইহা ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিয়া ফল নাই। তবে ইহা ঠিক্ যে, এ দেশের আপামর সাধারণ লোকশ্রেণী হইতে শিক্ষিত শ্রেণী এখন ক্রমে ক্রমে বড়ই দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছেন। কি জ্ঞানে, কি সভ্যতায়, নিম্নশ্রেণী হইতে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী দিন দিন বহু দূরে সরিতেছেন, কাজেই সহানুভূতির বাজারটায় দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই রহিয়াছে। ঢাকার "শক্তি" আক্ষেপই করুন, আর যাহাই করুন, নিম্নশ্রেণীর বক্ষার জন্য "শিক্ষালয়" (School) কি "অর্থালয়" (Bank), কোন আলয়ই মধ্যবর্ত্তী লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ইহাকে যদি জাতীয়তা গঠনের প্রথম সোপান বলিতে চাও, বল। মূর্ধ পর-প্রত্যাশীর দলকে যদি ভারতগগনের-উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে অভিনন্দন দিতে চাও, এবং বাড়ীতে নিমন্ত্রণ সভা গঠন না করিয়া ম্লেচ্ছের হোটেলে সুরা-পূর্ণ গ্লাসের মধ্যে স্বাস্থ্য-পানের ব্যবস্থা করিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিতে চাও, কর। আমরা এ সকলে কোন আশার কথা পাঠ করিতে না পারিয়া নববর্ষের প্রথমে কেবল নিরাশার ক্রন্দন তুলিয়া অস্থির হইতেছি! হিতৈ-ষণা, তুই আমাদিগের জন্য একটুকও আশা রাখিলি নে?

কাল আদ্মীর বুলি লইয়া যাদের ব্যবসা, এই ঘোর সাহেবীকরণের দিনে তাহাদের আর আশা ভরসা কোথায়? তোমার কাল মুখের মলিন বুলি—W. C Banerjeeই বল, P M Mukerjeeই বল এবং মহারাজা J. M. Tagoreই বল, পড়িতে বসিয়া আপন আপন গৌরব নষ্ট করিতে পারেন না। "বাঙ্গলা ভাষাটা রাখ কেন? ইংরাজি ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়ার যতটা সম্ভব, আর কোন ভাষার তেমন সম্ভব নাই"—কত বে-নামী, ক নামী হুজুগ-প্রিয় লেখক, বাঙ্গালা ভাষার সপিণ্ডীকরণ করিয়া, সঞ্জীবনী প্রভৃতি কংগ্রেস-প্রমুখ পত্রিকায় এই কথা ঘোষণা করিয়া "হাম্ বড়" বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হইতেছেন! সেই ভয়ে, বুঝিবা, প্রচার নীরব হইলেন, নবজীবন দাঁড়াইতে পারিলেন না, যোগেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র—এখন নীরব ভাষার সাধন করিতে বসিয়াছেন। আর রমেশচন্দ্র প্রাচীন আর্য্য ইতিহাস, সময় বুঝিয়া, ইংরাজিতে লিখিতেছেন ;—এবং কেহ কেহ রামায়ণ মহাভারতকে ইংরাজি করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন! উন্নতি

ত এক দিকে হয় না ;—সকল দিকেই সাহেবীকরণের ছটা। ইহাকেই প্রকৃত উন্নতি বলে! নব আমেরিকা, নব অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় ভারতবর্ষও নাকি জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষা ভুলিয়া একদিন স্বাধীন ইংরাজ হইয়া যাইবে! আমরা—এই প্রাচীন অধঃপতিত জাতি, মহাত্মা হাবার্ট স্পেন্সরের (Survival of the Fittest) যোগ্যতমের অধিষ্ঠান মতের খাতিরে জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া ইংরাজের উদরস্থ হইয়া যাইব। তাই সাহেবীকরণের বাজারে আনন্দের রোল উঠিয়াছে।

বাঙ্গলা কাগজের গ্রাহক জুটে না, যাহার জুটে, সেও মূল্য পায় না। বাঙ্গলা কাগজ কেহ পড়ে না, যাহারা পড়ে, তাহারাও সাধারণের ঘৃণার জিনিস। বাঙ্গলা ভাষা আফিস হইতে উঠিয়া গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে না,—দেশের সভাসমিতিতে চলে না,—জাতীয় মহাসমিতিতে গ্রাহ্য নয়, বরং ঘৃণ্য, এমন বাঙ্গলা ভাষা যে পড়ে, সে ঘৃণার জিনিস হইবে না? জানি না, কোন্ আশায় জমীদার পঞ্চায়ৎ-সভা এই চাষার ভাষা—এই অসভ্যদের ভাষাটা গ্রহণ করিয়া জাতীয়তা-হীনতা দেখাইয়া সাহেবীকৃত বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা হারাইতে বসিলেন। এই ভাষাতে যে কথা বলে, সে অসভ্য; যে পত্র লেখে, সে অসভ্য, যে বক্তৃতা করে, সে আরো অসভ্য! যে এই ভাষার পোষকতা করে, এই ভাষার সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্র পাঠ করে, বা কোন পুস্তক ক্রয় করে, সে ঘোরতর মূর্খ। এই জন্য একটা কথা উঠিয়াছে,—"বাঙ্গলা পুস্তক কিনি মেয়েদের জন্য।" কটকে এক জন বন্ধুকে নব্যভারতের গ্রাহক হইতে বলায়, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "মেয়েদের জন্য বামাবোধিনী লইতেছি, তাহাই তাহারা পড়িয়া উঠিতে পারে না—তাহাদের আর সময় কই?" এই অত্যাচার ঘৃণার ভয়েই, বুঝিবা যাহারা পত্রিকা গ্রহণ করে, তাহারাও মূল্য দেয় না। এমন অপকর্ম্ম করিয়া কি আর লোকের নিকট তাহা বলা যায়?

এ সকল কি অত্যুক্তি প্রলাপ বকিতেছি? যাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানেন, তাঁহারা কখনও একথা বলিবেন না। তোমাদের হিতৈষী-শ্রেষ্ঠ প্যারীমোহন, ও বন্দোপাধ্যায়-সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া, মুন্সেফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহাদের আমলাগণ পর্য্যন্ত, দুই দশজন বাদে প্রায় সকলেই বাঙ্গলা ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে! যে দু' পৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়াছে, সেও; যে কখন ইংরাজি স্পর্শও করে নাই, সেও। ইহার পরিচয় এদেশে

প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, প্রচার উঠিল কেন? এমন উৎকৃষ্ট জিনিস আদর পাইলনা, এ দুঃখ কোথায় রাখিব! পত্রিকার মূল্য যে আদায় হয় না, তাহার পরিচয়—"বঙ্গবাসীও উপহার-ঘুষ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন! এমন দেশব্যাপী ঘৃণার স্রোত আর কোন দেশে কখনও দেখা যায় নাই। ধন্য সাহেবীকরণ।

ভাবাতে চূড়ান্ত সাহেবীকরণ দেখাইলাম। ধর্ম্মে কি সাহেবীকরণটা কিছু কম? এক দিন মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিতে-ছিলেন যে, "এই কলিকাতায় এমন বড় লোক নাই, যিনি উইলসনের বাড়ীর খানা খান না।" ভাল মন্দ বিচারের ভার, পাঠকগণের হাতে, আমরা কেবল অবস্থাটা জানাইতেছি। শশধর, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, কৃষ্ণ প্রসাদ যে দেশের ধর্ম্মের তত্ত্বটাকে বক্তৃতার বিষয় করিয়া পাদরী সাহেবের ন্যায় ব্যবসা চালাইতেছেন, সে দেশের ধর্ম্ম কত দূরে যাইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, ভাবাও কঠিন। আমরা এই সকল মহাত্মাদের প্রতি ঘৃণা দেখাইতেছি না, তবে এই কথা বলিতেছি, ধর্ম্মটাকে বক্তৃতার আসরে নামাইয়া ইহারা হিন্দুধর্ম্মের অগৌরব করিতেছেন, অধিকারী ভেদে উপদেশ দেওয়ার অমূল্য তত্ত্বকে কর্ম্মনাশায় ডুবাইতেছেন,—ধর্ম্মকে বৃথা হুজুগে পরিণত করিতেছেন! ফল যাহা হওয়ার, খুব হইতেছে;—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থাকেও কেহ কেহ উন্নতির অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন! মোটের উপর কি হইতেছে, কেমনে বলিব? কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে, আমরা দিন দিন চরিত্রহীন হইয়া এক অপকৃষ্ট জীবের সৃষ্টি করিতেছি। যাক্, সে সকল দুঃখের কাহিনী বলিয়া আর কাজ কি?

এইরূপ ঘোরতর সাহেবীকরণরূপ নিরাশার ঘনঘটার মধ্যে পড়িয়াও আমরা কি আশায় রহিয়াছি? ১২৯৮ সালের গভীর শোকের পরও আবার মাথা তুলিতেছি কেন? কেহ কেহ এই প্রশ্ন তুলিতে পারেন। যে দেশে ভাল কাজেও সহানুভূতি প্রকাশ করিবার বন্ধু জুটে না, কর্ত্তব্য পালনে একটু সাহায্য মিলে না, চরণ ধরিলেও প্রসন্ন মুখের হাসি টুকুও উপহার পাওয়া যায় না, সে দেশে আবার এই আমরা, বাঙ্গালী, থাকি কেন? উত্তর—ইহাও মহাভুল!

মহামতি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, বুঝিয়াও ফিরিতে পারেন নাই,—

আমরা কর্ত্তব্য-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, বুঝিয়াও ফিরিতে পারিতেছি না। ফিরিয়া দাঁড়াই বা কোথায় ? যদি ধর্ম্ম যায়, ভাষা যায় ;—ভারতের আর বাকী থাকে কি ? কি লইয়া থাকিব ? কার মায়ায় থাকিব ? বুঝিতেছি, দিন দিন সাহেবীকরণেরই জয় হইতেছে, তবুও একটু একটু আশার কুহকে না মজিয়া পারিতেছি না। কালে আমরা কেহই থাকিব না—জানি ; কিন্তু আজই আমরা বিদায় লইতে পারিতেছি না। এ এক মহা ভ্রান্তির ঘোর ! ধন জন প্রাণ—সব এদেশের কর্ত্তব্যপালনে ফেলিয়া দিয়া শেষে পলায়ন করিব। কন্তা শোকের দারুণ আঘাতে, সাহেবীকরণের গভীর নিরাশার কশাঘাতে, বন্ধুবান্ধবগণের সহানুভূতি ও দয়ামায়া শূন্য কর্ত্তব্যরূপ মহাশ্মশানে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, সকল তীব্র বাণ সহ্য করিয়া করিয়া শেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। আমরা তারপর আর মাথা তুলিবনা। সেই দিন—সাহেবীকরণের ষোল-কলা এই ভারতশ্মশানে রাজত্ব করিবে। যেই দিন "বঙ্গবাসীর" গভীর হাহাকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাহারও চক্ষে আর বিন্দুমাত্র জলও পড়িবে না ; হার্বাট স্পেন্সার সাহেবের "যোগ্যতমের অধিষ্ঠান" মতের জয় জয়কারে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইবে।

কাল-মাহাত্ম্য। *

এই জড় এবং চেতনময় বিশ্বরাজ্যের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে ? পৃথিবীর মহা মহা পণ্ডিতবর্গ বলিয়াছেন যে, মানুষই বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বাস্তবিক, মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ শক্তির কথা মনে হইলে, মানুষকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মানুষ, পৃথিবীর অণু পরমাণু, জীবজন্তু, সৃষ্ট প্রায় সকল পদার্থকেই আপনার আয়ত্তাধীন রাখিয়া কর্ত্তব্যসাধন করিতেছে। মানুষের তুল্য শক্তিশালী বস্তু পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখা যায়। অভ্রভেদী হিমাচল, গভীর অতল-স্পর্শ প্রশান্ত মহাসাগর, অরণ্যের দুর্জ্জয় ব্যাঘ্র সিংহ, অমিততেজ হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি; অজ্ঞাত মহাশক্তি বিদ্যুৎ ও বায়ু, এ সকলই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কৌশল বলে মানুষের আয়ত্তাধীন হইয়াছে। মানুষকে ভয় করে না,

* ১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসে লিখিত।

সৃষ্টিতে এমন কোন জীব দেখা যায় না। আবিষ্কৃত পদার্থপুঞ্জের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা মানুষের কার্য্যের সহায়তায় লাগে নাই। সকল শক্তি, মানুষের শক্তির নিকট পরাস্ত, সকল দ্রব্য মানুষের ব্যবহারে লাগিতেছে। পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষ সৃষ্টির রাজা।

গভীর কল্লোল ও বিভীষিকাপূর্ণ বিশালহৃদয় বঙ্গোপসাগরতীরে দাঁড়াইয়া সাগরের বিচিত্রশোভা, সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছি,—দেখিয়াছি—আকাশের অনন্ত নীলিমায় সাগরের অনন্ত নীলিমা মিশিয়া গিয়াছে,—বায়ু-হিল্লোলে, দিক্ গর্জ্জনপূর্ণ করিয়া, গভীর হইতে গভীরতর বেগে উন্মত্ত উর্ম্মিমালা সকল খেলিতেছে,—অনন্তে অনন্ত মিশিয়া গিয়াছে; এই অপার বায়ু ও জলরাশির কোথায় শেষ, কোথায় আরম্ভ, ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া চক্ষের জল ফেলিয়াছি, কিন্তু ঐ বায়ু আর এই সাগরও মানুষের জ্ঞানের অধীন হইয়াছে, মানুষের কার্য্যে লাগিতেছে। মানুষ তন্ন তন্ন করিয়া, সাগরের কোথায় কি আছে, তাহা নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছে, অবলীলাক্রমে সাগর বক্ষে বিচরণ করিয়া দেশ দেশান্তরে যাইতেছে, লবণাক্ত জল হইতে লবণ উৎপন্ন করিয়া লইতেছে, মানুষ ঐ অনন্ত আকাশের সংখ্যাতীত নক্ষত্ররাজির সীমা গণিয়াছে, বায়ুকে আয়ত্ত করিয়া দেশ দেশান্তরে নৌকা ও জাহাজ চালাইতেছে, বেলুনযন্ত্রে বায়ুভরে গগনে বিহার করিতেছে॥ অভ্রভেদী হিমাচলশেখরে দাঁড়াইয়া, গগনোন্মুখ কাঞ্চনজঙ্ঘার স্খলিত বরফরাশি আকাশের ভাসমান মেঘরাশির সহিত মিলিয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, দেখিয়াছি, এবং বিষম ঝটিকার দিনে, মেঘের পশ্চাতে ধাবিত মেঘের ঘর্ষণে বিদ্যুৎপাতের সহিত প্রবল বায়ুর সংমিশ্রণে যে ভীষণ নাদের সৃষ্টি হয়, তাহা শুনিয়াছি, এবং স্তম্ভিত হইয়া ভাবিয়াছি,—মানুষ কত ক্ষুদ্র, এবং প্রকৃতি কত মহান্! কিন্তু প্রকৃতির এই ভীষণ বিদ্যুৎ ও বায়ুও মানুষের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, চির ভৃত্যের ন্যায় মানুষের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। প্রকৃতির কি অনন্ত নয়? চতুর্দ্দিকে যাহা দেখি,—সবই যেন অনন্ত। অণু পরমাণু পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়াছি, কিন্তু দেখিয়াছি, কাহারও সীমা নাই, শেষ নাই। প্রকৃতির অনন্তত্ব কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষের নিকট সান্ত রূপে প্রকাশিত হইয়া, নানাপ্রকার সাহায্য করিতেছে। মানুষ, সৃষ্টির রাজা। ইহার সমতুল্য আর কে আছে, ইহার ন্যায় প্রতাপ আর কার আছে!!

মানুষ প্রকৃতির রাজা বটে, কিন্তু রাজারও রাজা আছে। পৃথিবীর রাজার শক্তি যথেষ্ট, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এক জন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, "আমার সম্মুখস্থিত এই যে ক্ষুদ্র মানুষ, ইহার ভিতরে অনন্ত শক্তির তরঙ্গ খেলিতেছে;—বিধাতা ইহার চিন্তা-জগতে যে কি এক অব্যক্ত মহাশক্তির লীলা সৃজন করিতেছেন;—কে বুঝিবে, কে জানিবে, কে ভাবিবে?" মানুষের শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহার জ্ঞান, ইহার প্রেম, ইহার ভক্তি, ইহার চিন্তা—কতদূর প্রসারিত, মানুষ ধারণাও করিতে পারে না। এই যে দুর্জ্জয় মানব-শক্তি—এ শক্তি কিন্তু কালের দুর্জ্জয় পরাক্রমের নিকট চির-পরাজিত! ব্যক্তিগত ভাবে, মানুষ প্রকৃতির কোন কোন শক্তির নিকট পরাস্ত হইলে হইতে পারে, কিন্তু সমষ্টিতে যে মানুষ সৃষ্টির রাজা, ইহাতে চিন্তাশীল জগতের সন্দেহ নাই। কিন্তু কি ব্যক্তিগত ভাবে, কি সমষ্টিগত ভাবে—মানুষ চিরকাল কালের পরাক্রমের নিকট অবনতমস্তক। কালের কোথায় আরম্ভ, কোথায় শেষ,—বিবর্ত্তের পর বিবর্ত্ত,—ঘটনার পর ঘটনা—শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ, বৎসরের পর বৎসর—গণনা কর, কূল নাই, শেষ নাই,—আরম্ভ নাই, অন্ত নাই। পর্ব্বত কতদিন সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষ গণনা করিয়াছে, সমুদ্র কতদিন উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; চন্দ্র সূর্য্য কত দিন কিরণ দিতেছেন,—কত দিন দিবেন, মানুষ গণনা করিয়াছে—কিন্তু "সময়" কতদিন আরম্ভ হইয়াছে, মানুষ বুঝে না, জানে না। মানুষের উৎপত্তি, মানুষের পরিণতি,—সৃষ্টির এ গভীর প্রহেলিকা-রহস্য ভেদ করা কঠিন বটে, কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে, যতই অস্পষ্টরূপে হউক না কেন, ইহারও একটা নির্দ্ধারণ হইয়াছে, কিন্তু—"সময়" সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আবিষ্কার হয় নাই। কতদিন আসিয়াছে, কতদিন থাকিবে, কেহ জানে না, কেহ বলিতে পারে না। মানুষ প্রকৃতির রাজা, কিন্তু মানুষের রাজা "সময়"। মানুষ কালের দুর্জ্জয় পরাক্রমের নিকট চিরপরাস্ত।

প্রকৃতি, পরিবর্ত্তনময়। আজ যেমন, কাল তেমন নয়। মানুষ বিবর্ত্তিত হইতেছে, কীট পতঙ্গ বিবর্ত্তিত হইতেছে,—সাগর পর্ব্বতে রূপান্তরিত হইতেছে;—চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিও হ্রাস হইয়া বিবর্ত্তিত হইতেছে,—পৃথিবী, সৌরজগত সবই পরিবর্ত্তনের অধীন। কোন রাজ্যের পতন, কোন রাজ্যের উত্থান, কোন সাগর, পর্ব্বত বা মরুভূমিতে পরিণত; কোন পর্ব্বত বা মরু-

ভূমি সাগরে পরিণত হইতেছে। একই ভাব, একই অবস্থা প্রকৃতিতে দেখা যায় না। পরিবর্ত্তন-চক্র ক্রমাগত ঘুরিতেছে—অবস্থা হইতে অবস্থার উৎপত্তি, ঘটনা হইতে ঘটনার উৎপত্তি হইতেছে। প্রকৃতির রাজা যে মানুষ—এই মানুষেরও কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আণ্ডামান দ্বীপের একজন আদিম অধিবাসীর সহিত বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপের একজন প্রধান ব্যক্তির তুলনা করিলেই এই পরিবর্ত্তনের ভাব কতক হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মানুষ, চিরকাল পরিবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। পশুসম অসভ্য অবস্থা হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া মানুষ বর্ত্তমান সুসভ্য অবস্থায় ভূষিত হইয়াছে। ঘটনা যেন মানুষকে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া অভিনব রাজ্যে প্রতিনিয়ত লইয়া যাইতেছে। ঘটনার প্রসূতি "সময়"। সুতরাং একথা বলিলে অযৌক্তিক হয় না যে, সময় মানুষকে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে লইয়া যাইয়া আপন শক্তির মহিমা বা প্রতাপ ঘোষণা করিতেছে। মানুষ অবনত মস্তকে আবহমান কাল, সময়ের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। এই জন্যই বলি, মানুষ প্রকৃতির রাজা, মানুষের রাজা "সময়"। সময় যে কি—কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। অত্যুচ্চ পর্ব্বত শেখরে মানুষ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং করিতে পারে;—গভীর অতলস্পর্শ প্রশান্ত মহাসাগরে মানুষ পোতারোহণে বসবাস করিতেছে এবং করিতে পারে;—গাঢ় তুষারাবৃত আইসল্যণ্ডেও মানুষ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে, কিন্তু সময়ের বক্ষে, স্থির ভিত্তিতে, আজ পর্য্যন্ত কেহই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। সময়, আছে আছে, নাই নাই। দেখিতে না দেখিতে, ধরিতে না ধরিতে ঐ দেখ সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সময় এই যে নিমেষের মধ্যে যাইতেছে, ইহাতেই তোমাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া যাইতেছে। কিন্তু তুমি তাহাকে একটুও আয়ত্ত বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছ না। ওখানে তোমার সকল শক্তি পরাস্ত। এমন স্বাধীনতা, এমন উন্নতভাব আর কাহারও দেখা যায় না। কখন আসে, কখন যায়, কেহ জানে না, কেন আসে, কেন যায়, কেহই বুঝে না। কাছে আসিল, কিন্তু বসিল না, দেখা দিয়াই আপন ভাবে বিভোর হইয়া চলিল! রহিল কি, কেবল মানুষের জীবনে, প্রকৃতির জীবনের একটু পরিবর্ত্তন। কাহারও রূপ কাড়িল, কাহাকে বা রূপ দিল, কাহাকে সরস করিল, কাহাকে নীরস করিল; কাহারও কণ্ঠে মধুর স্বর ঢালিল, কাহারও

কণ্ঠকে জন্মের মত নীরব করিয়া দিল,—কাহারও ক্রোড়ে আনন্দের কেলি তুলিয়া দিল, কাহার জীবনে নিরানন্দ ও শোকের কালিমা লেপিয়া দিল ;— কাহাকে বা জীবন দিল, কাহাকে বা মরণের তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া আঁধারের কোলে শোয়াইয়া যাইল। কে জানে, সময় প্রতিনিয়ত কার জন্ত কি লইয়া আসিতেছে, ঘুরিতেছে, জাগিতেছে। ইহার ইঙ্গিতে রাজ সিংহাসন চূর্ণীকৃত হইয়া সাগরে ডুবিতেছে, কৃষকের পর্ণ কুটীরে অতুল ঐশ্বর্য্য জাগিতেছে ;—রাজা পথের ভিখারী হইতেছেন, পথের ভিখারী রাজ সিংহাসনে বসিতেছে। ইহার ইঙ্গিতে নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর অসংখ্য পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে! কিন্তু কেহই পূর্ব্বে বুঝিতে পারে না, কাহার প্রতি 'সময' সুপ্রসন্ন, কাহার ভাগ্যে অপ্রসন্ন। কাহার নিকট সময় কি বার্ত্তা লইয়া আসিতেছে, মানুষ কিছুই জানে না, বুঝে না। সময়ের আগমনে সকলে সশঙ্কিত, কম্পিত-কলেবর। সময়ের নিকট সকলে অবনত-মস্তক। সময়, রাজার রাজা।

মানুষের বড় অহঙ্কার যে, সে বড় পণ্ডিত, সে বড় ধার্ম্মিক, সে বড় শক্তিশালী। কিন্তু মানুষের পাণ্ডিত্য, মানুষের ধর্ম্ম, মানুষের সব জারিজুরি 'সময়ের' নিকট পরাস্ত। "সময়" যেন পাণ্ডিত্যাভিমানীর অহঙ্কার এই বলিয়া চূর্ণ করিতেছে যে, "মানুষ, তুই সব জানিস বলিয়া অহঙ্কার করিস্, বল্‌ত তোর জন্ত আমি কি লইয়া আসিয়াছি ?—জানিস্‌নে, বুঝিস্‌নে, অথচ অহঙ্কার! আমি তোর পাণ্ডিত্য কাড়িয়া, শত শত ব্যক্তিকে তোর উপরে শ্রেষ্ঠ করিয়া দিলাম, যা, শত জনের নীচে মৌনভাবে অবনত-মস্তকে বসে থাক্ যেয়ে।" সময, ধার্ম্মিক-অহঙ্কারীকে ঘটনার যাঁতায় পেষণ করিয়া, নানা অধর্ম্ম-ভূষণ পরাইয়া সকলের নীচে ফেলিয়া দিতেছে। মহা শক্তিশালীর সকল শক্তি কাড়িয়া লইয়া অহঙ্কার চূর্ণ করিতেছে। এইরূপে, প্রাচীন রোম গ্রীসের গর্ব্বিত বক্ষের উপরে ইংলণ্ড এবং জার্ম্মানিকে তুলিয়া দিয়াছে ;—প্রাচীন ভারতের আর্য্যবংশের উচ্চাভিমানের উপর ম্লেচ্ছের আধিপত্যের প্রবল প্রতাপ বিস্তার করিয়া জাতিভেদকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে,—আর ফরাসী রাজ্যে মহা পরাক্রমশালী নেপোলিয়নের চূর্ণ অস্থির উপর প্রজাতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে! কে এমন অহঙ্কারী আছে যে, চিরদিনের জন্ত অমিত তেজে জগতে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিয়াছে ? কে এমন আছে, যাহার দর্প কখনও চূর্ণ হয় নাই ? সময় দুর্জ্জয় পরাক্রমে

মানুষের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া আপনার দুর্জ্জয় প্রতাপ জগতে ঘোষণা করিতেছে!

ভাই অহঙ্কারী মানব, কেন আর বৃথা আত্মগৌরবে মগ্ন রহিয়াছ? একটু অপেক্ষা কর, দেখ, "সময়" তোমার জন্ম কি সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে। ঐ সুপ্রভাত তোমারও সুপ্রভাত কি না, কে জানে? আজ, নয় কাল, নয় পরশ্ব—একদিন না একদিন ঐ সময় তোমার অহঙ্কারকে চূর্ণ করিবেই করিবে;—তোমার ভস্মরাশির উপর আবার তোমার শত্রুকুলের বিজয়নিশান উড়াইবে। আর ভাই, তুমি দীন দুঃখী, তুমিই বা কেন রোদন করিতেছ?—ঐ "সময়" রাজার গৃহেও যেমন, তোমার গৃহেও তেমনি সমভাবে, অবিভেদে, সুখ দুঃখ আনয়ন করিতেছে। দুঃখ সহিয়াছ, স্থির হও, এ দিন ঘুচিবে, আবার মুহূর্ত্ত পরে সুপ্রভাত হইবে, আবার সুখ আসিবে,—আজ হউক, কাল হউক, আর কিছু না হইলেও চিরশান্তিময় মৃত্যু আসিয়া তোমার দারিদ্র্য-কষ্ট ঘুচাইবে। অপেক্ষা কর, দেখ, "সময়" তোমার জন্ম পর মুহূর্ত্তে কি আনিতেছে। সময় প্রতি মুহূর্ত্তে কাহাকে তীব্র দুঃখের সংবাদ, কাহারও কাণে কাণে মধুর আশার আশ্বাসবাণী শুনাইয়া পৃথিবীর অহঙ্কার ও দীনতার মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিতেছে। অতিরিক্তকে খর্ব্ব করিয়া, শূন্ত-ভাণ্ডারকে পূর্ণ করিতেছে। বড়কে ছোট এবং ছোটকে বড় করিয়া সাম্যমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করিতেছে। "সময়ের' ন্যায় সাম্য এবং শান্তি-সংস্থাপক রাজা ভূমণ্ডলে আর নাই। এমন মধুর আশার বাণী আর কি কাহার বাঁশী শুনাইতে পারে? এমন আর কেহ পারে না। কাল, আজ নববর্ষে তোমার শুভাগমনে আমরা ভীতচিত্তে তোমাকে অভিবাদন করিতেছি; তোমার পরাক্রমের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতেছি।

কিন্তু কাল কি? কালাতীত মহাকালের ছায়া মাত্র। কাল আসিতেছে বলিলেই বুঝি, কালাতীত মহাকাল নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। তিনি আঁধারময়, কল্পনা বা চিন্তার অতীত, তাই তাঁর ছায়াও চিন্তা বা কল্পনার অতীত। কায়ার ছায়া এই সময়; অথবা "সময়" বিধাতার "শাসন-বংশী",—অথবা বিধাতার পুরস্কার ও দণ্ডের এক মাত্র অবলম্বন-যষ্টি। কাহাকেও আশীর্ব্বাদ, কাহাকেও দণ্ড দিবার জন্ম এই সময়-যষ্টিকে বিধাতা প্রতিনিয়ত জগতে ঘুরাইতেছেন। "সময়" পৃথিবীতে স্বর্গ ও নরক সৃজন করিয়া—পুণ্য এবং পাপের পুরস্কার ও দণ্ড দিতেছে। কি মহিমা, কি কৌশল, লীলাময়ের কি আশ্চর্য্য লীলা!!

আমরা "সময়ের" ঢেউরূপ বৎসরাদির হিসাব গণিয়া গণিয়া এখন পরাস্ত হইয়াছি। আমাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে। মহেশ্বরের এ মহা পাশা-খেলায় কিছুতেই জয়লাভ করা হইল না। যতবার খেলা আরম্ভ করিয়াছি, ততবার হারিয়া গিয়াছি,—একবারও জয়লাভ করা হয় নাই। আজ আমরা পরাজিত হৃদয়ে, নববর্ষের আগমনে, অবনত মস্তকে, মহিমা ও ও লীলাময় হরিকে প্রণিপাত করি এবং বলি—"নারায়ণ, বংশীধারি, তোমার এ ছায়ালীলা-খেলায় আর জয়লাভ করিতে পারিব না, এখন পরাজয় স্বীকার করিয়া তোমার স্মরণ লইতেছি, যাহা ইচ্ছা, তুমি তাহাই কর, যাহা ইচ্ছা সময় বংশীতে তাহাই শুনাও। যত দুঃখের তীক্ষ্ণ বাণ থাকে, সব সহিব,—কিন্তু নাথ, দে'খ যেন তোমাকে ভুলিয়া না থাকি! দয়াময়, সকল অবস্থাতে তুমি প্রাণের মূলে বিদ্যমান থাকিও, কারণ তুমি ভিন্ন আর যে আশা ভরসা কিছুই নাই। তোমার যাহা ইচ্ছা, তুমি তাই কর। আগ্রত ভারতকে অতলজলে ডুবাইয়াছ, সময়ের তরঙ্গাঘাতে ভারতের উন্নতিকে সহস্র বৎসরের পশ্চাতে ফেলিয়াছ; তার জন্যও আর আক্ষেপ করিব না, আর চক্ষের জল ফেলিব না। যেরূপে ইচ্ছা—তোমার সময়-দণ্ডকে তুমি পরিচালিত কর—তোমার ইচ্ছার নিকট পরাজিত হইয়া এখন ভারতবাসী তোমার চরণ-রেণুতে মিশিয়া থাকুক, এই একমাত্র প্রার্থনা। জ্ঞান বুদ্ধি, শক্তি বীর্য্য,—আপনার বলিতে মানুষের, এই ভারতবাসী মানুষের যাহা কিছু আছে, সব ডুবাইয়া, নাথ, তোমার ঐ স্নেহাশীর্ব্বাদ, তোমার ঐ পদরেণু, তোমার ঐ বিশ্বাস-কণা তুমি সকলের প্রাণে বর্ষণ কর। আমরা আর কিছু চাই না, তোমার পদানত ভৃত্য হইয়া চিরকাল যেন ঐ অভয় চরণ তলে পড়িয়া থাকিতে পারি। অহংজ্ঞানকে ডুবাইয়া, তোমার উপর পূর্ণ নির্ভর করিয়া দুর্জ্জয় কালের অতীত হইয়া, হে কালাতীত অনন্ত ভূমামহান্, তোমার স্নেহস্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া, সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদকে যেন চিরকাল সমভাবে আলিঙ্গন করিতে পারি। হে কালাতীত, নববর্ষের অচিন্ত্য, ভীষণ, দুর্গম, অন্ধকারময় আক্রমণে ভীত ও সশঙ্কিত হইয়া আজ তোমার চরণে স্মরণ লইতেছি; তুমি আশ্রয় দেও, আমাদিগকে অভয়বাণী শুনাও, তোমার জীবন্ত ভাবে পূর্ণ কর।

পুরাতন ও নূতন।*

নূতনের ধারে পুরাতন থাকে না। বৃক্ষে নূতন পত্রের উদ্গম হইলে, পুরাতন পত্র খসিয়া পড়ে। নূতন ফুল ফুটিতেছে দেখিলে পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়ে। নবীন সূর্য্য উঠিতেছে দেখিলে চাঁদ পলায়। নববসন্ত আসিতেছে দেখিলে শীত অন্তর্দ্ধান হয়। নূতন বন্ধুর উদয়ে পুরাতন বন্ধু লজ্জায় মুখ নত করিয়া চলিয়া যায়। নূতন বৎসর আসিতেছে দেখিয়া পুরাতন বৎসর থাকিবে কেন? ৯৯ উদয়ে ঐ দেখ ৯৮ সাল কালের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। নূতন, পুরাতনের উত্তরাধিকারী। নূতন পুরাতনের চিরসঞ্চিত সম্পদরাশিতে প্রতিষ্ঠিত।

পুরাতন যাহা, তাহাই যায়, নূতন যাহা, তাহাই থাকে। সকল জিনিসেরই হ্রাস বৃদ্ধি আছে। বৃদ্ধি পাইতে পাইতে জিনিসগুলি এমন অবস্থায় পৌঁছে যে, আর বৃদ্ধি সম্ভবে না। তখন সে পুরাতনের মধ্যে গণ্য হয়। তখনই সে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। আর কিছুদিন পর, তার ধারে আবার নূতন গজাইতে দেখিলেই সে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়ে।

হ্রাস বৃদ্ধির কথাটা বলিয়াছি ত আর একটু ভাল করিয়া বলি। ছোট ছেলেটী ক্রমাগতই বড় হইতেছে। কত ভাব, কত শিক্ষা, কত রূপ, কত শোভা, কত বুদ্ধি, কত প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ফুটিতেছে। ক্রমাগত সে বাড়িতেছে। তেজ বল, সৌন্দর্য্য বল, বুদ্ধি বল, প্রতিভা বল, সব বাড়িতেছে। কাল সে যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নয়। বাড়িতে বাড়িতে যখন সে বার্দ্ধক্যে উপস্থিত, তখন আবার তাহার সব হ্রাস হইতে লাগিল। সৌন্দর্য্য ডুবিতেছে, বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে। দন্ত নড়িল, চর্ম্ম শিথিল হইল, কালচুল পাকিল, সে ক্রমে ক্রমে আরো পুরাতন, আরো পুরাতন হইতে লাগিল। শেষে নবীনের পার্শ্বে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া, নবীনকে সকল সম্পদ ছাড়িয়া দিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিয়া মরণকে চুম্বন করিল। নূতন আসিল, পুরাতন সরিল। অথবা একই দেবতার বিভিন্নরূপ ফুটিয়া বাহির হইল।

মানুষ সম্বন্ধে যাহা, জাতি সম্বন্ধে তাহা, দেশ ও রাজ্য সম্বন্ধে তাহা।

---

* ১২৯৯ সালের বৈশাখ মাসে লিখিত।

ভৌতিক কি চেতন, সর্ব্বত্রই এই এক কথা। পূর্ণকলা প্রাপ্তির পর সকল জিনিসেরই হ্রাস হয়। ক্রমে ক্রমে, নূতন যখন আইসে, পুরাতন তখন খসিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র সম্বন্ধে এই নিয়ম, বৃহৎ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই যে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী, ইহাও একদিন তাঁহার ইচ্ছায় নিবদ্ধ ছিল, আবার ভবিষ্যতে স্থিতিতত্বে লীন হইবে। ঐ যে চন্দ্র সূর্য্য, উহাও একদিন নির্ব্বাণ হইবে। তখন ইহাদের স্থানে কি নূতনের অভ্যুদয় হইবে, আমরা কল্পনা করিতে পারি না। কল্পনা করিতে পারি না বলিয়াই যে সৃষ্টির অলঙ্ঘ্য বিধির ব্যতিক্রম ঘটিবে, এমন কোন কথা নাই। পুরাতন মরিবেই মরিবে, নূতন আসিবেই আসিবে। বিধির ইচ্ছা-তত্বের বিকাশ এমনই করিয়া হইতেছে।

রোম ও গ্রীস যখন উন্নতির চরমসীমায় উঠিয়াছিল, তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, এই দুই জাতির আবার মহাপতন হইবে। তাহাদের রক্তমাংস, হাব ভাব, জ্ঞানবিজ্ঞান, সভ্যতা ও চরিত্র-বল লইয়া ইংলণ্ড মস্তক তুলিল যখন, তখন তাহারা মরণের কোলে শয়ন করিল। প্রাচীন আর্য্যজাতির উন্নতির যুগে কে ভাবিয়াছিল যে, এই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী? মুসলমানগণ যখন উন্নতির মুকুট মাথায় পরিল, তখন আর্য্যদের গৌরবভূষিত মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। কালের দুর্জ্জয় প্রভাবে একজাতির উন্নতিমুকুট অপর জাতির মস্তকে তুলিয়া দিয়া বিধাতা জগতের যে কি মহা কল্যাণ সাধন করিতেছেন, জানি না; তবে এরূপ যে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? ইংরাজজাতি আজ উন্নত, কিন্তু যখন এই উন্নতির ষোল কলা পূর্ণ হইবে, তখন ইহাকেও যে মরিতে হইবে না, কে জানে? মরণ সকলেরই ভাগ্যে ঘটিবে, কিন্তু হায়, সকলেই মায়ার ঘোরে আচ্ছন্ন, কেহই এ বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী নয়। লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলা।

এই যে উত্থান ও পতন, ইহা ধর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি সম্বন্ধেও যেমন, জাতি বা দেশ সম্বন্ধেও তেমনি। ধর্ম্মমূলক ভিত্তি হইলে উন্নতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, নচেৎ পতন বা মৃত্যু অল্পেই ঘটে। রোম, গ্রীসের পতন, ধর্ম্মপতনের পূর্ব্বাভাস। ভারতীয় আর্য্যজাতির পতনও ধর্ম্ম-পতনের শেষ আভাস। মুসলমান জাতির ধর্ম্মোন্মত্ততা প্রাচীন ভারত গ্রাস করিয়াছিল, ইংলণ্ডের নবধর্ম্ম ভাব গ্রীস ও রোমের সভ্যতা গ্রাস করি-

য়াছে। আবার মুসলমান জাতির মহাপতন যদি ধর্ম্মপতনে হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্মোদ্দীপ্ত নবীন ভারত যে তাহাকে পূর্ণ গ্রাস করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ইংলণ্ডের ধর্ম্মপতন এখনও হয় নাই, এখনও তুলা দণ্ডে পাপ ও পুণ্য সমতুল, সুতরাং ইংলণ্ডের পতনের এখনও বহু বিলম্ব আছে। কিন্তু পতন যে আসিবে, প্রকৃতির প্রতি গাঢ় মনোনিবেশ করিলে, এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া আর থাকা যায় না।

নবীন ভারতে এখন শুধুই নূতনের খেলা। বাল্যকালে চপলতা থাকে, ইহাতে তাহা আছে; বাল্যে অদম্য উৎসাহ থাকে, ইহাতে তাহাও আছে। জাতীয় মহাসমিতির প্রতি তাকাও, বাল্যের চঞ্চলতা দেখিবে, বাল্যের অদম্য দুর্জ্জয় উৎসাহও দেখিবে। নব্যভারত এখন নিত্য নূতন। শোভা সৌন্দর্য্য, বল বিক্রম, বুদ্ধি প্রতিভা নব্যভারতে নিত্য নব বেশ ধারণ করিতেছে। ছোট ছেলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান, সভ্যতা গৌরব, বুদ্ধি, প্রতিভা, পুণ্য ও চরিত্র-বল, নবীন ভারতের ভিত্তিমূল। এখানে মরণ নাই। এখানে পতন নাই। এখন কেবল উন্নতি, এখন কেবল উন্নতি। এই উন্নতির মূলের ধর্ম্ম যদি স্খলিত হয়, তবে বহুকাল নব্য-ভারত জগতে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপন গৌরব ঘোষণা করিবে বলিয়া বোধ হয় না। আর যদি তাহা না হয়, উন্নতির পর উন্নতি, অনন্ত উন্নতি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইবে; কে বাধা দিবে? পুণ্য ও সত্যে, ধর্ম্ম ও চরিত্রে, নবীন ভারত মহা তেজিয়ান হউন, পতন বহুদূরে পলায়ন করিবে। অদৃষ্টে পতন আছেই—দশ বৎসর পরে, আর শত বৎসর পরে। এখন নানারূপ নিরাশার কথা থাকিলেও আমরা একবারে আশা-শূন্য হই নাই। এখন বৎসর বৎসর নব্যভারত উন্নতির দিকেই ছুটিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সাহেবীকরণ ক্রমে ক্রমে একটু মন্দীভূত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। জাতীয় একপ্রাণতা বল, আর জাতীয় ভাষা বল, জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ বল, আর জাতীয় ধর্ম্মভাব বল, যেরূপেই হউক, এ সকলের প্রতি প্রগাঢ় মনোনিবেশ যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উন্নতির ষোল কলা পূর্ণ হইতে অনেক বাকি রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু নূতন হইতে আরো নূতনে নব্যভারত যাইতেছে না, এ কথা মোটেই স্বীকার করি না। পৃথিবীর উন্নতি শেষ হইলে যেমন পৃথিবী লোপ পাইবে, নব্যভার-তের উন্নতি শেষ হইলেও নব্যভারত তেমনই লোপ পাইবে। আমরা এখন

অনন্ত অভাবেই ভাসিতে চাই। ধা করিয়া উন্নতির চরমসীমায় পৌঁছিতে চাই না। যে উন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফল, মহা জাতীয় পতন, আমরা জড়বাদের ঘোর অমাবস্যা-পূর্ণ সে উন্নতি চাই না। পরে কি আসিবে, কে রাজত্ব করিবে, আমরা তাহা জানি না। নব্যভারতের পর আর কি আসিবে, তাহা বিংশ ত্রিংশ শতাব্দীর গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাহা আমাদের চিন্তা এবং বুদ্ধির অগম্য।

নব্যভারতের উন্নতির জন্য অংশতঃ আমরা সকলেই দায়ী। এদেশের জলবায়ুতে যখন জীবনধারণ করিতেছি, তখন এদেশের কোন না কোন বিভাগের কাজ আমাদিগকে করিতেই হইবে। প্রত্যেকের কাজ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, প্রত্যেকের কাজ আছে বলিয়াই বিধাতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কাহাকে ঘৃণা বা তুচ্ছ করিলে চলিবে না। পুরাতন আর নূতন, একত্র সমাবেশ করিতে হইবে। যুবক বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ, সব মিলাইতে হইবে। তুমি বড় ক্ষমতাশালী, বড় ধনী, বড় জ্ঞানী, তুমি ভাবিতেছ, ঐ রাস্তার মুটের, ঐ গরীবের, ঐ মূর্খের এ জগতে কোন কাজ নাই। তুমি বড় বুদ্ধিমান্, তুমি প্রাচীন প্রথা সকলকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতেছ; তুমি জান না যে, তোমার ভিত্তি প্রাচীনে প্রতিষ্ঠিত। ভাই, এ অসার ভেদ-বুদ্ধি ছাড়। তোমারও যেমন দরকার, ঐ নিরেট বোকা মূর্খ অজ্ঞানেরও তেমনি দরকার, পুরাতনের ধারে নূতনের প্রয়োজন বলিয়াই নূতনের অভ্যুদয়। সময় আর কিছুই নয়; পুরাতন ও নূতনের বন্ধনরজ্জু। তুমি বড় ধার্ম্মিক, তুমিও জগতের পাপী তাপীদিগকে এত ঘৃণা করিতেছ? উচ্ছৃঙ্খল যুবক বৃদ্ধকে ঘৃণা করে, প্রাচীন নবীনকে তুচ্ছ করে, তাহারা অন্ধ, তাহাদের পক্ষে বরং এ সকল সাজে, কিন্তু তোমার হৃদয়ে এ গরল কেন? মনে রাখিও, তোমাকেও যিনি সৃজন করিয়াছেন, উহাদিগকেও তিনিই সৃজন করিয়াছেন, তোমাকে যিনি রক্ষা করিতেছেন, উহাদিগকেও তিনিই রক্ষা করিতেছেন। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সকলেরই কাজ আছে। মনে রাখিবে, তাঁহার ইচ্ছা, সকলের দ্বারা পূর্ণ হইবে, কেবল তোমার দ্বারা নহে। ঘৃণা কিসের জন্য, ভাই, অহঙ্কারই বা কিসের জন্য? তোমার অর্থ, যশ, গৌরব—বলত উহা কয়দিনের? তোমার জ্ঞান, ধর্ম্মাভিমান, উহাই বা কয়দিনের? আজ আছে ত কাল যাহার অস্তিত্বের স্থিরতা নাই, তাহার জন্য এত মাতামাতি কেন ভাই? মানুষ ডুবিবে, জাতি ডুবিবে, দেশ ডুবিবে,—

অস্তে থাকিবে কি? কেবল মহেশের মহান্ ইচ্ছা, কেবল প্রেমময়ের অপূর্ব্ব প্রেমলীলা-কাহিনী—কেবল অনন্ত কালসাগরের বৈচিত্র্যময় তরঙ্গরাশি। এখন এই ভূলোকে, এত ভেদাভেদ বৈষম্যের মধ্যে আছে কি? তাঁহারই মহা ইচ্ছা। তাঁহারই ইচ্ছায় তুমি আমি সকলেই আসিয়াছি, তাঁহারই ইচ্ছায় রহিয়াছি। বড় ছোট সকলের মধ্যেই তিনি; সুই সকল বস্তুই তাঁহার বিকাশ। স্বাধীনতার জোরে ভেদবুদ্ধি ধরিয়া তোমরা যে অহঙ্কার-স্ফীত হইয়া পরস্পরকে ঘৃণা করিতেছ, ইহা পরিহার কর এবং সময়ের নিগূঢ় রহস্যজাল ভেদ করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুগত হইয়া দিন রাত্রি পরিশ্রম কর। মস্তকের ঘাম পায়ে ফেলাইয়া, ফলাফল-নিরপেক্ষ হইয়া, ক্রমাগত খাট। তিনি যেমন জগতের জন্য খাটিতেছেন, তেমনি ভাবে খাট। সম্প্রদায়গত শক্তির বাঁধ ছিন্ন করিয়া, মহেশ্বরের মহান্ সিংহাসন তলে দাঁড়াইয়া, আত্ম-পর ভুলিয়া তাঁহার ভাবে মাতোয়ারা হইয়া পরস্পরের জন্য ভাব এবং খাট। জ্ঞানী মূর্খ, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টিয়ান—সকল ভাই ভাই, সকল এক প্রেমে, এক ধ্যানে মগ্ন। নব্যভারত তাঁহারই। এই নব্যভারতে তাঁহার ইচ্ছার তলে থাকিয়াও যদি ভেদবুদ্ধির বশবর্ত্তী হও, তুমি ত ডুবিলেই, সেই সঙ্গে নব্যভারতকেও ডুবাইলে। নব্যভারতকে ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর—সকল সম্প্রদায়ের উপরে যে বিশ্বজনীন প্রেমের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর। মহাত্মা বুধ, মহাত্মা ম্যাট্সিনি, মহাত্মা খ্রীষ্ট, মহাত্মা শ্রীচৈতন্য যে অহেতুকী অকৈতব প্রেমের মহাসাধনা করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই সামান্য কয়টী কথা "প্রেম" "Love" এর সাধনা কর। এস, তুমি আমি সকলে মিলিয়া পাঁচ ফুলের সাজি সাজাইয়া তাঁহার পূজা করি। তুমি আমি পাঁচ জনে তাঁহার নব্যভারত-সিংহাসন তুলিয়া ধরি। যাহার যাহা করিবার, করিয়া যাই। উপেক্ষা, ঘৃণা, পরিত্যাগ করি। নিন্দা, তিরস্কার, নির্য্যাতন, সব ভুলিয়া যাই। ভাই, এই ঘোর দুঃখের দিনে, আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। নবীন ভারত উঠিতে উঠিতে পড়িয়া যাইতেছে, দেখিতেছ না? একতা, সাম্য, মৈত্রীর সমাবেশ ভিন্ন আর রক্ষা নাই। তাই, দোহাই বিধাতার, এস, তাঁহার নামে এক মহাপ্রাণতায় মাতি। তাহার পর তাঁহার ইচ্ছায় যাহা থাকে, হইবে। পুরাতন বৎসর ডুবিয়াছে যখন, তখন নিশ্চয় নূতন বিধান আসিয়াছে। নূতন বৎসরে পুরাতন ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া, পুরাতন পাপ-

পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, নূতন প্রেমে নবীন ও সরস হও। এস ভাই, নূতন বৎসরে এই নূতন প্রতিজ্ঞা করি যে, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোককে ভাই বলিয়া পূজা করিব। সকলকে বিশ্বপিতার সন্তান বলিয়া আদর করিব। ইহাই স্বর্গ, ইহাই মুক্তি, ইহাই বৈকুণ্ঠ। সকলের আশীর্ব্বাদ ও পদধূলি মস্তকে লইয়া এস সকলে জমাট প্রেমে দেহ প্রাণ ডুবাইয়া দেই। মহান্ ঈশ্বরের মহান্ ইচ্ছার জয় হউক।

ইংরাজ রাজত্বের কলঙ্ক।

"তোমরা ব্রিটিশ জাতি, পবিত্র উৎসাহে মাতি
ধরার দাসত্ব প্রথা করিলে বারণ,
তোমাদেরি ছায়াতলে তোমাদেরি করতলে,
ভারত দাসত্বে আজ হ'ল নিগমন।"

শুভক্ষণে ভারতে ইংরাজাধিকার বিস্তৃত হইয়াছে, শুভক্ষণে অত্যাচার-প্লাবিত দেশে সাম্যের বিজয় ভেরী বাজিয়াছে। যাঁহারা দুই দশ দিনের জন্যও ভারতের কোন স্বাধীন দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা অম্লানচিত্তে স্বীকার করিবেন যে, দেশীয় শাসনাধীনে যে সকল রাজ্য আছে, তাহা সদা অত্যাচার পীড়িত, সদা ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছা-বিতাড়িত; সে সকল স্থানে স্বাধীন ভাবে দুটা কথা বলিবার যো নাই, সে সকল স্থানে রূপযৌবন, ধন, জন, বিদ্যা—কিছুই নিরাপদ নহে। সে সকল স্থানে স্ত্রীলোকের সতীত্ব, পুরুষের বীর্য্য বা প্রতিভা—ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ প্রতিপালিত। বৈষম্যের লীলা, স্বেচ্ছার কেলি, পরাধীনতার ক্রীড়া দেখিতে চাও, গবর্ণমেণ্টের রাজ্য ছাড়িয়া ক্ষণকাল দেশীয় স্বাধীন বা করদ রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া এস। ভাল মন্দ বিচার ক্ষমতা যত দিন মানুষের আছে, ততদিন এ কথা অম্লান চিত্তে বলিবই বলিব, অত্যাচার-অন্ধকার প্লাবিত ভারত, ইংরাজ-সূর্য্যোদয়ে আলোকিত, পুলকিত, নবীভূত, জীবনপ্রাপ্ত।

চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, পদ্মের মৃণালেও কণ্টক আছে। এমন যে ইংরাজ-রাজত্ব, এক মুখে যাহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না,

ইহারও কলঙ্ক আছে। থিয়োডোর পার্কার নবোত্থিত আমেরিকার দাস-প্রথা উন্মোচনে যত্নবান্, আমেরিকার চতুর্দ্দিকে তাঁহার শত্রু। ইংরাজ যদি দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইতেন, তবে পৃথিবীর এক বিভাগ এখনও অত্যাচারের কুক্ষিগত থাকিত। ম্যাট্‌সিনি অষ্ট্রিয়ার তাড়নায় যখন নির্ব্বাসিত, ইংলণ্ড তখন কোল পাতিয়া মানব-দেব-শিশুকে গ্রহণ করিলেন। ম্যাট্‌সিনি সে কথা জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। গ্যারিবল্‌ডি ক্লান্ত কলেবরে, অবসন্নশরীরে, যুদ্ধাহত হইয়া যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান, ইংলণ্ড তখন স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন; ইংলণ্ড তখন স্বাধীন বীরের শয্যার পার্শ্বে শুশ্রূষার কোমল হস্ত লইয়া দণ্ডায়মান। এমন স্বাধীনতার বন্ধু, পরাধীনতা ও বৈষম্যের মহা শত্রু, প্রতিভার চিরসহায় এ পৃথিবীতে ইংলণ্ডের মত আর কে? আমাদের গৌরব যে, আমরা এমন রাজার অধীন হইয়াছি। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা এমন পরদুঃখকাতর রাজার স্নেহ-ছায়ায় প্রতিপালিত হইতেছি। ধন বল, জন বল, এখন সকলই নিরাপদ। এই দস্যুর দেশে এখন দিন দিন স্ত্রীজাতির সম্মান বৃদ্ধি পাইতেছে, লুণ্ঠন, অপহরণ তিরোহিত হইতেছে, মানুষ এখন রাত্রে সুখে শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছে। সত্যযুগের কথা জানি না, সুতরাং ঠিক বলিতে পারি না:—এমন সুখ শান্তি ভারতের ভাগ্যে বুঝি বা আর কখনও ঘটে নাই। কিন্তু এমন যে রাজত্ব, ইহারও কলঙ্ক আছে। সে কলঙ্ক কি, সংক্ষেপে লিখিতেছি।

গতপূর্ব্ব অধিবেশনের সময়, গবর্ণমেণ্ট, জাতীয় সভাসমিতির একটু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, অনেকেই জ্ঞাত আছেন। কলিকাতায় এমন যে ধুমধাম পূর্ণ আয়োজন হইতেছিল, নিমেষের মধ্যে, গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত মাত্র, সে সকল যেন কেমন মলিন উৎসাহহীন হইয়া উঠিল! অনেক বড় বড় লোক সমিতির কাজে যোগ দিলেন না, বহু প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হইলেন না, অনেক রাজা রায়বাহাদুর ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"আমরা জাতীয় সমিতিতে নই!" এটী একটী সামান্ত ঘটনা, কিন্তু এ ঘটনায় বুঝিলাম, ইংরাজ ভারতকে মায়াবলে ঘোর অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছেন, বুদ্ধি বা প্রতিভা, তেজ বা সাহস—সব এখন ইংরাজ-কর কবলে; বুঝিলাম, যাহাকে জাতীয়তা বলে, ভারতে তাহা ত বহু দূরে, স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরও এদেশে নাই। আমি স্তায় ও ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া

যাহা কর্ত্তব্য বুঝি, তাহাও করিতে পারিব না, তাহার জন্যও অন্যের দিকে তাকাইব? ইহা যদি হইল, তবে আর মনুষ্যের রহিল কি? জাতীয় মহাসমিতি ইটালীর ক্যাভাগ্‌নারির ন্যায় গুপ্ত সম্প্রদায় নহে যে, ইহাতে যোগ দিলে দোষ বা পাপ হয়। নানা উপায়ে গবর্ণমেন্টের সহায়তা করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই পতিত জাতির উদ্ধার করা গবর্ণমেন্টের কাজ; জাতীয় মহাসমিতিরও কাজ। সুতরাং কেহ কাহারও বিরোধী নহে। জাতীয় মহাসমিতির ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা যে গবর্ণমেন্টের বিরোধী সভা নহে, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। "তবে কেন ইহাতে যোগ দিব না? গবর্ণমেন্ট বিরুদ্ধ হইলেন, তাতে আমার কি?"—স্বভাবতঃ স্বাবলম্বী জীবের এইরূপ ভাবই হওয়া উচিত। কিন্তু দেখিয়া দুঃখে অবসন্ন হইলাম যে আমাদের দেশে সেরূপ জীব বড়ই দুর্লভ। ভারত পর হাতে সমর্পিত, পর পদে বিক্রীত। জাতি, মান, কুল, কর্ত্তব্য, আচার প্রণালী, ধর্ম্ম—সবই যেন এখন ইংলণ্ডের হস্তে। দেখিলাম এবং ভাবিলাম, ভাবিয়া বুঝিলাম, ইংলণ্ড ভারতের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বাবলম্বনের ভাবকে, আত্মনির্ভরের শক্তিকে, অতি সুকৌশলে, চিরকালের জন্য বিনষ্ট করিয়াছেন। ইহাই ইংরাজ রাজত্বের কলঙ্ক।

গৃহস্থের ঘরে একটী পাখী। পাখীকে গৃহস্থ এমন ভাল ভাল জিনিস খাওয়ায়, পাখী আরণ্য জীবনে যাহা চক্ষেও দেখিত না। পাখী খায়, নাচে, আর আনন্দে গায়। পূর্ব্বে একবার একবার গৃহস্থের মায়া-শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িতে চাহিত, তখন গৃহস্থ মনে করিত, এত ভালবাসি, তবুও পলাইতে সাধ? থাক্ দেখি, কি হয়। ক্রমে ক্রমে বহুদিন পর ভালবাসায় মজাইয়া পাখীকে গৃহস্থ এমন করিয়া ভুলাইল যে, আর ছাড়িলেও পাখী উড়িয়া পলায় না। যদি একটু যায়, আবার পরক্ষণেই ফিরিয়া আইসে। তখন পাখীকে গৃহস্থ তিরস্কার করে, আর বলে, "কেমন, আর কখনও বনে যাইতে সাধ করিবি?"

পাখীর সুখ আর আমাদের সুখ, দুই-ই তুল্য। পিঞ্জরে বসিয়া একটু নাচিলে বা একটু গাইলেই অমনি সুমিষ্ট আহার উপস্থিত। আফিসে ৩০ দিন আসা যাওয়া করিয়া একটু কলম চালাইয়া, একটু তোষামোদ করিলেই মাসান্তে টাকা হাজির। সহজে, সুলভে আহার হাজির। কেমন সুকৌশলে ইংরাজ আমাদিগকে বশ করিয়াছেন!

সাহিত্য-বাজার, স্বাধীনতার লীলাস্থল; কিন্তু এস্থলও এখন ব্যবসাদারী ও তোষামোদ নামক অধীনতার হস্তে বিক্রীত। ভাবোন্মত্ত লেখক লিখিবে,—জগৎ-নিরপেক্ষ হইয়া, আদর-অনাদর-নিরপেক্ষ হইয়া লেখক জগতের অতীত স্থানে বসিয়া মঙ্গল তান ধরিবে, তাহা না হইয়া এখন লোকের প্রশংসা, গবর্ণমেন্টের সাহায্য-প্রত্যাশী হইয়া লেখকগণ কলম ধরিতেছেন। টেষ্ট-বুক কমিটী নামক একটা তোষামোদে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট দস্যুকে এই স্বাধীনতার বাজারে ছাড়িয়া দিয়া গবর্ণমেন্ট ক্রমে ক্রমে সকলকে অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিতেছেন, এবং বহু অর্থ প্রকারান্তরে পুরস্কার দিতেছেন। ছাইভস্মের বিনিময়ে নিরক্ষর ব্যক্তিরাও টাকা পাইতেছে দেখিয়া ক্রমে বড় বড স্বাধীন লেখকগণও অধীনতায় বিনীত হইয়া, লেখনীকে সংযত করিয়া, অর্থ প্রত্যাশারূপ নরককে বুকে পুরিতেছে।

চাকুরী করিতে করিতে, অর্থ প্রত্যাশা ধরিতে ধরিতে, আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদে, কথাবার্ত্তায় ভারতবাসী এখন স্বাবলম্বনহীন, আত্ম-নির্ভরহীন। ধর্ম্ম বড়, না চাকুরী বড়? জাতীয়ত্ব বড়, না টাকা বড়? সাহিত্য বড় বা অর্থ বড়? অনেকেই বলিবেন, চাকুরি বড়, টাকা বড়। সাহিত্য বা ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া, জাতীয়ত্বের খাতিরে কে আজকাল চাকুরি বা টাকার মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয় ইয়ং-সাহেবের মতে অম্লানচিত্তে সায় দিতে না পারিয়া, আত্মসম্মানের খাতিরে গবর্ণমেন্টের বহু বেতনের চাকুরি ইস্তফা দিয়া মনুষ্যত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। এদেশে কিন্তু বিদ্যাসাগরের ন্যায় তেজিয়ান, স্বাবলম্বী বীর আর বড় বেশী নাই। চতুর্দ্দিকে একই মধুর রব,—চাকুরী, চাকুরী, টাকা টাকা টাকা। যে "এম এ" পাশ করিয়াছে, সেও ইহারই জন্য লালায়িত, যার ঘরে অর্থ রাশীকৃত, স্তূপীকৃত, সেও, কি জন্য কে জানে, গবর্ণমেন্টের পদানত! মনুষ্যের অভাব বৃদ্ধিকে অর্থ-লালসার কারণ বলিয়া ধরিলে, তাহারও মূল ইংরাজ রাজত্ব। কেবল টাকা, কেবল অভাব! দেখিতেছি, ইংলণ্ডের শিক্ষায় জাতি, ধর্ম্ম, কুল মান ভুলিয়া মানুষ কেবল অর্থের দিকে ছুটিয়াছে। সাম্যের অর্থ এখন—কেবল অর্থোপার্জ্জন, কেবল চাকুরী। ভেদাভেদ নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক কর্ম্মে নিয়োজিত। ইহাতে জাতিভেদ উঠিতেছে বলিয়া আমরা অবশ্য আনন্দিত, কিন্তু এই সাম্যে মনুষ্যত্ব স্বাবলম্বন, আত্ম-সম্মান তিরোহিত হইতেছে দেখিয়া আর চক্ষের জল

সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। চাকুরী ছাড়িয়া কে তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে, কে পরোপকার ব্রত ধরিবে, কে দেশের সেবা করিবে? দারিদ্র্যের ঘোর নিষ্পীড়নে ক্লিষ্ট হইয়া কে তোমার সাহিত্যকে উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত করিবে? শিল্প ও কৃষির উন্নতি রুদ্ধ হইল, স্বাধীন বাণিজ্য লোপ পাইল, সুকুমার সাহিত্য টেক্সটবুক-কমিটীর এক-টানা সুরে সাধা হইল—এখন চতুর্দ্দিকে কেবল আচার-ভ্রষ্ট, পর-পদানত, অর্থ-প্রত্যাশীর দল পরিশোভিত! এমন দিগন্তব্যাপী দাসত্ব-প্রথা যে দেশের রাজা হাতে ধরিয়া শিক্ষা দিতেছেন, সে রাজাকে, পাথীর উপকারী বন্ধু গৃহস্থের সহিত তুলনা করিতে ভয় কি? ইংলণ্ড পৃথিবীর যে উপকার করিয়াছেন, এমন আর কোন জাতি করে নাই, মুক্তকণ্ঠে আজীবন একথা স্বীকার করিব। ইংলণ্ড ভারতেরও অশেষ গৌরবের শিক্ষার স্থল, সন্দেহ নাই, কিন্তু দাসত্ব-প্রথায় ভারতের অস্থি মজ্জা আজ গ্রাসিত। উঠিতে চাহিলে উঠার সাধ্য নাই, যাইতে চাহিলে যাওয়ার সাধ্য নাই। ইহারও মূল ইংরাজ-রাজত্ব। মাসান্তে বা বৎসরান্তে যে টাকা আসিবে, তাহার মায়ায় ভুলাইয়া, এই প্রতিভান্বিত, আর্য্যবংশধর জাতিকে চিরদাসত্ব-কলঙ্কে নিমজ্জিত করা গবর্ণমেন্টের কতদূর সঙ্গত হইতেছে, ধীরভাবে একবার চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা জানি, ইংলণ্ড মনে করিলে, ছোট ছেলেকে পিতামাতা যেরূপ মানুষ করেন, দশ বিশ বৎসরের মধ্যে সেই-রূপ, ভারতবর্ষের শিশু জাতিকে, প্রতিভায়, স্বাধীন বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে ও ভাষাতে শিক্ষিত বা দীক্ষিত করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য মহিমান্বিত জাতির সমকক্ষ করিতে পারেন। ইংরাজি শিক্ষার আলোকে কুসংস্কারের অন্ধকার হইতে উত্তোলন করিয়া এই জাতিকে চিরদাসত্বে নিমজ্জিত করা বিধেয় নহে। হাত—ইংলণ্ডের। শিশু ভারতবর্ষকে যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ গড়িতে পারেন। আমরা গবর্ণমেন্টের একান্ত পক্ষপাতী। ভারতের মঙ্গলের জন্য, বিধাতার ইচ্ছায় ভারতে ইংরাজের আগমন, বিশ্বাস করি। এদেশে ইংরাজের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, মনে করি। কিন্তু সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের চরণে এই বিনীত অনুরোধ, এ জাতি যেন দাসত্ব-গঠিত ক্রীড়া-পুত্তলিকা বিশেষ না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি করুন। গড়িয়া পিটিয়া ইংলণ্ড আমাদিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, আত্ম নির্ভর, স্বাবলম্বন শিক্ষা দিয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করুন; এবং পৃথিবীকে যশোরাশিতে পূর্ণ করুন।

নচেৎ এখন যেমন দাসত্বের লীলা বিস্তৃত হইতে দেখিতেছি, ইহাকে ইংলণ্ডের কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত করিবই করিব। ভারতবাসীকে দাসত্বে না ডুবাইয়া ইংলণ্ড প্রকৃত মনুষ্যত্বে উত্থিত করুন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

এত দেশব্যাপী ব্রাহ্মবিদ্বেষের কারণ কি? (১)

এমন এক সময় ছিল, যখন সকলেই ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে প্রশংসা করিত। ব্রাহ্মনাম তখন সর্ব্বজন-প্রিয় ছিল। কিন্তু আজকাল তাহার বিপরীত দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজ অথবা ব্রাহ্মদিগকে ঘৃণা করে না, এমন লোক বিরল। অল্প সময়ের মধ্যে কেন এরূপ হইল, ধীরচিত্তে ব্রাহ্মসাধারণের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। একশ্রেণীর ধারণা, ব্রাহ্মবিদ্বেষের কারণ, দেশের অধোগতি। অপর শ্রেণীর ধারণা, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান। কেহ কেহ বা বলেন, জাতিভেদ-নাশই ব্রাহ্মবিদ্বেষের মূল কারণ। ঐ সকলের মধ্যে আংশিক সত্য থাকিলেও,আমরা ব্রাহ্মবিদ্বেষের অন্তবিধ কারণ মনে করি। আমাদের প্রক্ষিপ্ত চিন্তার মধ্যে কোন সত্য থাকিলে, ব্রাহ্ম সাধারণ সে গুলির একবার আলোচনা করেন, অনুরোধ। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত কারণে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মসাধারণ দেশের বিদ্বেষের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছেন।

১। প্রথম কারণ—আমাদের অনুদারতা বা সঙ্কীর্ণতা। এখন ব্রাহ্মসমাজ নানা দলে বিভক্ত। মতের বিভিন্নতা হেতু, একদলের লোক অন্ত দলের লোকের মহত্ব দেখিতে অক্ষম। যে ব্যক্তি যে গণ্ডীতে, সে ব্যক্তি সেই গণ্ডীর দাসানুদাস। দল-বাদের কাছে ব্যক্তিগত বিবেক-

---

(১) এই প্রবন্ধটি লইয়া খুব আন্দোলন উঠিয়াছিল। অনেক চিন্তাশীল, বিজ্ঞ, প্রাচীন ব্রাহ্ম প্রবন্ধটীর প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, নব্য ব্রাহ্মেরা কেহ কেহ বিরুদ্ধেও বলিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইবার পর ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগে নানা সংস্কারের অনুষ্ঠান হইয়াছে। এই প্রবন্ধটী ১২৯৮ সালের পৌষ মাসে নব্যভারতে প্রকাশিত হয়, এই বৎসরের মাঘোৎসবে সকল সমাজই সমাজের অভাব-পক্ষ লইয়া বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন, ইহা সুখের বিষয়।

বুদ্ধি পরিম্লান। পূর্ব্বে এমন ছিল, একজন ব্রাহ্মের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আনন্দে অপরের প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইত, এখন আদরের পরিবর্ত্তে পরস্পরকে ঘৃণা করাই যেন ব্রত। বিধাতার রাজ্যে প্রত্যেক বস্তুরই বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেকের মধ্যেই মহত্ব আছে, ইহা ভুলিয়া, ব্রাহ্মগণ ভিন্ন দলের লোক-দিগের মিথ্যা নিন্দাঘোষণায় সদা ব্যাপৃত। এইরূপ নিন্দাঘোষণায়, ক্রমে ক্রমে, ব্রাহ্মসাধারণ দেশের নিকট অপ্রিয় হইয়াছেন। পরস্পরের নিন্দা-ঘোষণায় এই ফল হইয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজে যে ভাল লোক আছে, সর্ব্ব-সাধারণের এ বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। এইরূপে ব্রাহ্মেরা আপনাদের সুনামে আপনারা কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

কেবল ইহাই নহে। হিন্দুসমাজের লোকদিগকে ব্রাহ্মেরা ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন না। হিন্দুসমাজের লোকদিগকে সাধারণত ঘৃণার চক্ষে দেখাই যেন সচেতন-ব্রাহ্ম-স্বভাব। হিন্দুসমাজে ভাল লোক নাই, ছোট ছোট ব্রাহ্মেরও এরূপ ধারণা। ব্রাহ্ম-সাহিত্য একদেশদর্শী, অন্য সাহি-ত্যকে ব্রাহ্ম ভাল চক্ষে দেখেন না। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা কর, আমি তোমাকে ঘৃণা করিবই। বিশ্বজনীন উদার প্রকৃতিলাভ, ও ঘৃণার পরিবর্ত্তে সম্মান প্রদর্শন করা যার তার কর্ম্ম নয়। ব্রাহ্মেরা সকলকে ঘৃণা করিবেন, আর সকলে ব্রাহ্মদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে, এরূপ দীর্ঘকাল চলিতে পারে না। ব্রাহ্মদের সার্ব্বজনীন ঘৃণা, ব্রাহ্মদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে, লোক সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছে। কি সংক্রামক নিন্দা-স্রোত, সমালোচনা নামে ব্রাহ্ম-গ্রামে চলিয়াছে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

২। দ্বিতীয় কারণ, সঙ্কীর্ণতার আর একদিক্, কপটতা-মূলক অহঙ্কার। সাধকেরা বলেন, তৃণের ন্যায় দীন এবং পাগলের ন্যায় সরল না হইলে ধর্ম্ম লাভ হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ কপটতার দর্পে, আপন গৌরবে স্ফীত-বক্ষ। ব্রাহ্ম আপন দোষ ঢাকিতে শশব্যস্ত, কাহারও কথা ব্রাহ্মের সহ্য হয় না। কেহ একটু কটু কথা বলিলে ব্রাহ্ম রাজদ্বারে যাইতে পর্য্যন্ত উদ্যত! চরিত্র এখন আইন আদালতে রক্ষা করিতে হয়। ভিতরের কোন লোক সরল-ভাবে কিছু বিরুদ্ধে লিখিলে তাহার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধের জন্য, ব্রাহ্ম ব্যতি-ব্যস্ত হয়। হাটে বাজারে তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিবে, সভা সমিতিতে নিমন্ত্রণ বন্ধ করিবে, তাহার সহিত কথা বলিবে না, একত্র আহার করিবে না, তাহার ভিটাবাড়ী উচ্ছিন্ন করিতেও চেষ্টা করিবে, ইত্যাদি

নানা আস্পর্দ্ধার কার্য্যে এই অহঙ্কার পরিস্ফুট। দোষীকে দমন করিতেও এরূপ অযথা উপায় অবলম্বন করা বিধেয় কি না, তাহা এখনকার দিনে বিজ্ঞ লোকের গভীর চিন্তার বিষয়, আর এখনকার ব্রাহ্মসমাজ নির্দ্দোষীকে লাঞ্ছনা দিতে, এইরূপে সদা খড়্গহস্ত। "ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা?—এত বড় আস্পর্দ্ধা?—পাশব বলে মুখ বন্ধ কর,"—লোকের এইরূপ ভাব। স্ফীত-বক্ষ ব্রাহ্মের পদভরে ধরা কম্পবান, তাহার প্রতি কথায়, প্রতি চাহনিতে ইহা দেদীপ্যমান্‌। দুদণ্ড কোন সাধারণ ব্রাহ্মের সহিত আলাপ কর, বুঝিবে, পৃথিবীতে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও চরিত্রে তার অপেক্ষা আর যেন উন্নত লোক নাই। সে না পড়িয়া পণ্ডিত, কিছু না জানিয়াও মহা জ্ঞানী। কিসের যে এই আস্পর্দ্ধা, সময়ে সময়ে চিন্তা করিয়া আমরা অবাক্‌ হইয়াছি। ধার্ম্মিক কোথায় তৃণের ন্যায় দীন হইবে, না, কপটতা গৌরবে উন্নত-মস্তক। যাহার দশ বিশ সহস্র টাকা বা সম্পত্তি আছে, যে মাসে হাজার দেড় হাজার টাকা বেতন পায়, তাহার কথা বলি না, অহঙ্কারে বুকফুলান বরং তাহার পক্ষে শোভা পায়, কিন্তু যে গরীব, বিশ টাকা ত্রিশ টাকা যার আয়, যে ঋণে ডুবিয়া রহিয়াছে, যে দুটা কথা ঠিক রাখিতে পারে না, তাহারও এইরূপ অহঙ্কার।। দুনিয়ার কেহকে ব্রাহ্ম গণনায় আনিতে চাহে না। এইরূপ অহঙ্কারের পরিচয় পাইয়া সর্ব্বসাধারণ ব্রাহ্মদের সংস্পর্শে আসিতে ভয় পায়। মানুষ আর সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মানুষের দর্প বা অহঙ্কার সহ্য করিতে পারে না। এমন কি, বিধাতাও তাহা সহিতে পারেন না। অতি দর্পে হতা লঙ্কা।। খ্রীষ্ট বলিতেন, উচ্চ হইতে বাসনা থাকিলে নীচ হও। বিনয় ও সরলতা যে ধার্ম্মিকের অমূল্য ভূষণ, তাহা দিন দিন আমরা ভুলিয়া যাইতেছি।

৩। তৃতীয় কারণ—সহানুভূতির অভাব। ব্রাহ্মদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি নাই, ইহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। বিপদের দিনে মুখে সকলেই তোমার সাহায্য করিতে চাহিবে, কিন্তু কাজের বেলায় তুমি ঐ বিপদে যাহাতে আরো পড়, তাহার চেষ্টা করিবে। স্ব স্ব লইয়াই সকলে ব্যস্ত। কেহ যদি কাহার উপকার করে, কোন লোক যদি সদা-ব্রত গ্রহণ করে, লোকের উপকারের জন্য স্কুল স্থাপন করে, তাহার সাহায্য করা দূরে থাকুক, অমনি দশজনে বলিবে, এই কাজে উহার স্বার্থ আছে।। দয়ার দ্বার রুদ্ধ করিতে, সকলে না হউক, অনেক ব্রাহ্ম সদা লালায়িত। আমরা

জানি, কেবল সহানুভূতির অভাবে অনেক লোক ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। এমন এক সময় ছিল, যখন দুঃখী পাপীদের প্রতি ব্রাহ্মদের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। এখন এমন হইয়াছে, দুঃখী পাপীদের নাম শুনিলে অনেক ব্রাহ্ম কাণে হাত দেন! পাপীদের প্রতি পাপীদের সহানুভূতি নাই, (কেননা, বিধাতার নিকট সকলেই পাপী) এ দৃষ্টান্ত কোন ধর্ম্মসমাজে যদি দেখিতে চাও, তবে ব্রাহ্ম-সমাজ অন্বেষণ কর। ৭ বৎসর বয়স্ক একটী বালিকাকে তাহার বেশ্যামাতা কোন ব্রাহ্ম বন্ধুর হাতে দিয়াছেন। দেখিয়াছি, ইহাকে গৌরবের বিষয় মনে না করিয়া ভ্রাতারা আশ্রয়-দাতাকে ঘোর লাঞ্ছনা দিয়াছেন! এমনই সহানুভূতি। যে সমাজ দুঃখী পাপীর কথা ভুলে, সে সমাজ অধিক দিন টিকিতে পারে না। ঈশা, শ্রীচৈতন্ত দুঃখী পাপীর সেবা করিয়া অমর হইয়াছেন, আর আমাদের চক্ষের সম্মুখে জেনেরেল বুথ দুঃখী পাপীর সেবায় জীবন সমর্পণ করিয়া ধন্ত হইতেছেন। দলে দলে পাপী ত্রাণ পাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু এ পথকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিতেছেন। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে অনেক দিন হইতে যত্নবান। এখন দেখিতেছি, হিন্দু সমাজ এ বিষয়ে কতক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, একদিন যাহারা ভয়ানক পাপী ছিল, আজকাল ব্রাহ্ম-সমাজের গুণে তাহারাই সমাজের অগ্রণী হইয়া অন্ত পতিতদিগকে তুচ্ছ করিতেছে। পতিতোদ্ধার যাহাদের ব্রত হওয়া উচিত, তাহারা কেন যে এরূপ মমতাহীন হইয়া উঠিতেছে, বুঝি না। এমন এক সময় ছিল, যখন জাতিধর্ম্ম ভুলিয়া ব্রাহ্ম পরের উপকার করিতেন, এখন নিজের সমাজের লোকের উপকারই করেন না, পর ত দূরের কথা। আতিথ্যপ্রথা ব্রাহ্মসমাজে বড় একটা নাই। সকল সময়ে সব স্থানে ভিক্ষুক ভিক্ষা পায় না। কোন কোন ব্রাহ্ম বলেন, যাহাকে বিধাতা মারিতেছেন, আমরা তাহাকে সাহায্য করিব কেন? প্রকাশ্ত বক্তৃতা স্থলে আমরা আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত দয়া-ব্রতের বিরুদ্ধে অনেক কথা ব্যাখ্যাত হইতে শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের হাতে এখন বিশেষ কোন পরোপকারের কাজ বড় একটা দেখিতে পাইবে না; কার্য্য বা সেবা-জগতে ব্রাহ্ম-সমাজ মরণের মুখে। দাতব্য-বিভাগ নামে আছে, কিন্তু কাজে নগণ্য। সেবায় জগৎ মুগ্ধ, সেবায় জগৎ বশ। সার্ব্বজনিক হিতজনক কাজ হাতে না থাকিলে লোকে ব্রাহ্মদের আদর করিবে কেন, বলত?

দিন দিনই ব্রাহ্মদের সৎকার্য্য লোপ পাইতেছে, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজ আপামর-সাধারণের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

৪র্থ।—প্রেমের অভাব, সহানুভূতি নাই, সুতরাং প্রেমও নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে প্রেম জিনিসটা ব্রাহ্মসমাজে বড়ই দুর্লভ। প্রেমের আকর্ষণ, মহা আকর্ষণ। বহু দূরের কথা নয়, যে প্রেমের গুণে বুথ সাহেবের আজ্ঞাধীনে লক্ষ লক্ষ লোক ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় কার্য্য করিতেছে, যে প্রেমে বুথ রাস্তার ধুলিকণা কুড়াইয়া স্বর্গের দেবতা সকল গড়িতেছেন; সেই প্রেমের অভাবে ব্রাহ্মেরা দিন দিন ছিন্ন-ভিন্ন, লণ্ড-ভণ্ড হইয়া পড়িতেছেন। যে দিকে চাই, কেবল শুষ্কতা, কেবল মতের ঝগড়া, কেবল নীরস পরনিন্দাবাণী, কেবল বৈষম্যের তীব্র কোলাহল, কেবল ছোট বড়-ভেদাভেদ-জ্ঞানের নিত্য-নব-লীলা। প্রেমের অভাবে ব্রাহ্মেরা ভিতরে বাহিরে শত শত দলে বিভক্ত, ভালবাসার অভাবে ব্রাহ্মেরা কেহ কাহার গুণ দেখিতে পারেন না, অথবা গুণকেও দোষ বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রেমের অভাবে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি এখন ছিন্নমূল। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কোথায় পশু পক্ষীকে পর্য্যন্ত ভালবাসিবে, এখন ব্রাহ্ম স্বদলের লোককেও ভালবাসিতে পারে না, বাহিরের লোক ত দূরের কথা! ভাব, কেমন প্রেম। জৈনদের ন্যায় মৎস্যমাংসত্যাগী ব্রাহ্ম অনেক দেখা যায়, কিন্তু ভ্রাতা-দ্রোহী নয়, পরনিন্দাকে কণ্ঠের ভূষণ করে নাই, এরূপ ব্রাহ্ম এখনকার দিনে মিলে অল্প। উৎসবে ক্রন্দনের রোল প্রতি বৎসরেই শুনা যায়, কিন্তু উপাসনাগৃহের বাহিরে আসিয়া পরনিন্দা করে না, বিধাতার পুত্র কন্যাকে ঘৃণা করে না, এমন লোক বড়ই বিরল। হায়, বিধাতার প্রেম-ভিখারী নর নারী, তাঁহার সৃষ্ট নর নারীকে কত অপ্রেম চক্ষে দেখিতেছে! "এ ব্যক্তি পতিত, এ ব্যক্তি অপরাধী, এ রমণী বেশ্যা, এ রমণী কুলটা,—আর আমি স্বর্গের রাজা!!" কি নিদারুণ অপ্রেমের কথা, কি আস্পর্দ্ধা-গর্ব্বিত বাণী! ভালবাসার অভাবে দয়া গেল, মমতা গেল, এই ব্রাহ্মসমাজ একটা শুষ্ক মরুভূমি সদৃশ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজের এক সময়ের অতি আদৃত প্রেমের বাজার, এখন সমালোচনা নামক একটা প্রকাণ্ড দস্যু অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যে অন্যকে ভালবাসে না, সে অন্যের ভালবাসা কিরূপে পাইবে? আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, প্রেমের অভাবে দিন দিন ব্রাহ্মসমাজ জগতের ভালবাসা হারাইতেছে।

৫। পঞ্চম কারণ—চরিত্র-বলের অভাব। উৎসবে মাতে অনেক লোক, কিন্তু চরিত্রবান লোকের সংখ্যা অল্প। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, স্থানে স্থানে কয়েকজন পুণ্যশ্লোক ক্ষণজন্মা পুরুষ আজও আছেন বলিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ এখনও দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু বহু লোক যে কথায় ধার্ম্মিক,—সমাজ-সংস্কার বা পোষাকের খাতিরে ধার্ম্মিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই, বোধ হয়, দিন দিন দেখিতেছি, কঠোর পরীক্ষার দিনে অনেকেরই পদস্খলন হইতেছে। এ কথা বলিলে ব্রাহ্মেরা রাগ করেন,—ইহা চরিত্রহীন-তার অন্যতর প্রমাণ। যে প্রকৃত চরিত্রবান, সে অন্যের কথায় রাগে না। বিধাতার নিকট যে খাঁটি, লোকের প্রশংসার জন্য লালায়িত বা নিন্দার ভয়ে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট সে কখনও নয়। এখন দেখি, ব্রাহ্মেরা সাধারণের ভয়ে জড়সড়। এই কাজ করিব, মানুষেরা কি বলিবে ? ধর্ম্ম কি বলিবে, এরূপ আদর্শমূলক কথা বড় একটা কেহ ভাবে না, মানুষেরা কি বলিবে, ইহাই অনেকের চিন্তা। বলি ধর্ম্ম বড়, বিধাতার আদেশ বড়, না লোকের প্রশংসা বড় ? অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি, ব্রাহ্মসমাজ অন্যকে চালাইবে কি, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ যেন দেশ-সাধারণের দ্বারা চালিত হইতেছে। সাধারণের ভয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতা খর্ব্বতা লাভ করিতেছে, জাতি-ভেদ নানারূপ ধরিয়া পুনরুদিত হইতেছে, সাধারণের ভয়ে পতিতজনকে আশ্রয় দিতে ব্রাহ্মেরা কুণ্ঠিত হইতেছে, সাধারণের ভয়ে বীরের ন্যায় বিবে-কের আদেশ পালনে বীতশ্রদ্ধ হইতেছে। ভক্ত কেশবচন্দ্র বলিতেন যে, "লোকের কথায় ভাল কাজও করিব না, বিধাতার কথায় করিব।" ব্রাহ্মেরা কিন্তু লোককেই আজকাল অধিক-মান্য করিয়া চলিতেছে। চরিত্রে যে অটল, সে কখনও মানুষকে এত ভয় করিয়া চলিতে পারে না। সে বীরের ন্যায় আপন মনোমত কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিয়া যায়, মানুষের নিন্দা বা প্রশংসার ভিখারী হয় না, মানুষের ভয় রাখে না। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিব না, কেননা, চরিত্রবলে একা খ্রীষ্ট, একা শ্রীচৈতন্য, একা মহম্মদ, একা বুদ্ধ জগতে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—আর ব্রাহ্ম সমাজ যায় যায়—যাইতে বসিয়াছে। সত্যের আদর, পুণ্যে আস্থা থাকিলে এমন করিয়া সমাজ ছারখার যায় না। হায়, ধর্ম্মকে আদর করিলে এমনি করিয়া পাপের অত্যাচার বাড়ে না; দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় না।

৬। ষষ্ঠ—সাধনায় সিদ্ধির অভাব। কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, দল ছাড়িয়া

অন্তপথ অবলম্বন করায়, সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, ব্রাহ্ম-সমাজের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না। অটলভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে সাধনায় অসাধ্য কি, জানি না। নেপোলিয়ন বলিতেন, ' অসম্ভব" নামক কথাটা অলস ব্যক্তিদের সৃষ্টি। মন্ত্রগ্রহণ করিয়া যে প্রকৃত সাধনা করে, তাহার নিকট অসম্ভব কিছুই থাকে না—সাধনায় গিরি উল্লঙ্ঘন করা যায়, সমুদ্র মন্থন করা যায়। রিপু ইত্যাদি দমন করা ত দূরের কথা, সাধনায় বশ করা যায় না, এমন পশুও জগতে নাই। সাধনায় সিদ্ধির অভাবে লোভী ব্রাহ্ম, রিপুপরায়ণ ব্রাহ্ম, ক্রোধপরায়ণ ব্রাহ্ম, পরদ্বেষী ব্রাহ্ম, হিংসুক-ব্রাহ্ম—কতরূপ ব্রাহ্মের কথা আজকাল শুনা যায়। ইহার পর হয় ত, চোর-ব্রাহ্ম, দস্যুব্রাহ্ম দেখা দিবে। উৎসব আসিতেছে লোক সকল এখনই মাতিবার জন্ম ব্যতিব্যস্ত হইতেছে, কিন্তু হায়, ইহার মধ্যে কয়টী লোক সাধনায় সিদ্ধ, জানি না। ধর্ম্মটা যেন এখন স্থানে বা সময়ে নিবদ্ধ! অমানুষিক ধৈর্য্য নাই, কঠোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা নাই, অটল ব্রতপরায়ণতা নাই, ব্রাহ্মেরা স্বেচ্ছাচারিতা-পবনের সাহায্যে, স্রোতের শৈবালের স্থায়, আজ সংসার-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে! দশটা এমন লোক দেখি না, যাঁহারা মন্ত্রে অটল-ভিত্তি, যাঁহারা দলবাদের উপরে উঠিয়া বীরের স্থায় বলিতে পারেন, "স্বর্গও যদি চূর্ণ হয়, তবুও সত্য ও ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দিব।" গুরুবাদ ব্রাহ্মসমাজে নাই বটে, কিন্তু সাধনা-হীনতায় মনুষ্যের বিশেষত্ব খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে,—পাপের বিরুদ্ধে স্বর তুলিতে মানুষ যেমন ভীত হইতেছে, সমাজের দুর্গতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তেমনই ভয় পাইতেছে। আত্মীয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়াও এখন ব্রাহ্মেরা দলের প্রশংসা বা ভালবাসার খাতিরে দুর্গতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছে না। গুরুবাদের স্থান এখন দলবাদরূপ দাসত্ব-প্রথা দখল করিয়াছে। ইহা কি কম দুঃখের বিষয় যে, ব্রাহ্ম-সমাজে কপটতা প্রশ্রয় পাইতেছে! গুরুবাদ নাই, কিন্তু দলবাদ সর্ব্বনাশ করিতেছে। দলবাদ গড্ডলিকার প্রবাহ সৃজন করিতেছে। একজন যে পথে যাইতেছে, না বুঝিয়াও দশজন সেই পথে ছুটিতেছে। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন সাধনার ফল। স্বাধীন সাধনার অভাবে স্বাধীন চিন্তা লোপ পাইতেছে। ইহাতে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ধর্ম্মনিমগ্ন ব্যক্তি বিরল। যে প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহাকেও যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং"

মন্ত্র সাধনা করিতে হইবে, এমন কি অকাট্য যুক্তি তুমি দেখাইতে পার? দেখে নাই, বুঝে নাই, অথচ সেও এই মন্ত্র রোজ পাখীর মত উচ্চারণ করিতেছে। যে কখন সন্দেশ খায় নাই, সে যেমন সন্দেশের মিষ্টত্ব ধারণা করিতে পারে না, ইহাতেও সেইরূপ ফল হইতেছে। দশজনে যাহা করে, আমার তাহা কর্ত্তব্য হইতে নাও হইতে পারে। বিধাতার নিকট ভিন্ন কাহারও নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা বিধেয় নহে। কেননা, আমার অভাব অন্যে বুঝে না, কেননা, আমার শরীর মন সকল মানুষ হইতে বিভিন্ন। বিধাতার ইচ্ছা যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বজায় থাকিবে। এই হিসাবে গুরুবাদ, দল-বাদ পৃথিবীতে থাকিতে পারে না, রাখা উচিত নয়। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের এমনি সাধনার প্রণালী—এক পথ ধরিয়াই চলিতে হইবে, একটু এদিক ওদিক হইলেই গোল। অসম্ভব সম্ভব করিতে গিয়া ফল এই হইতেছে, দিন দিনই দল বৃদ্ধি পাইতেছে,—দিন দিনই মানুষ ভিতর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের খোসা ধরিতেছে। বৈরাগ্য এখন গৈরিকে, অথবা মৎস্য মাংস আহার ত্যাগে; ভক্তি, এখন মধুর কথা উচ্চারণে,—চরিত্র এখন বাহ্য পরিচ্ছদে। সারধর্ম্মের ভিতরে অল্প লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছে, বাহির ধরিয়া বাহির লইয়াই অনেকে চলিতেছে। পরিধানে গৈরিক বস্ত্র লইলে যেমন প্রকৃত বৈরাগ্য হয় না, মুখে মন্ত্র জপ করিলেও সেইরূপ সাধনা হয় না। অন্তরে, আত্মার মূলে অবগাহন করা চাই, সত্যপান এবং পবিত্রতা হজম করা চাই। দুঃখের সহিত বলিতেছি, এইরূপ সাধনার পথে অন্তরায়, ব্রাহ্ম সমাজের একদেশদর্শী সাধন-প্রণালী। ব্রাহ্ম-সমাজের সাধন-প্রণালী, ব্যক্তিত্বের বা বিশেষত্বের ভয়ানক বিরোধী। এইজন্য এই প্রণালীর সাধনায় সিদ্ধ হন, অতি অল্প ব্যক্তি। এইজন্য, বিজয় বাবু ও রামকুমার বাবু-প্রমুখ ব্যক্তিগণ দল ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছেন। তাঁহারাও যে স্বাধীন সাধনার বিরোধী এবং সর্ব্বনাশী গুরুবাদে জর্জ্জরিত, ইহা অবশ্য দুঃখের বিষয়। অবশ্য ইহা দুঃখের কথা যে, তাঁহারা আবার দল প্রস্তুত করিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ সৃজন করিতেছেন। সাধনাকে প্রতি ব্যক্তির উপযোগী করিতে হইলে যে গভীর চিন্তার প্রয়োজন, ব্রাহ্ম-সমাজের বহির্মুখী সাধনার প্রণালীতে তাহা দৃষ্ট হয় না। পতন, চরিত্রহীনতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, পরনিন্দা এজন্য ব্রাহ্মদের পক্ষে অপরিহার্য্য। সুতরাং সাধারণের ভালবাসা না পাওয়ার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান?

শেষ কথা এই—ব্রাহ্মের বিশ্বাস ও নির্ভর-হীনতায়ই বর্ত্তমান অধোগতির

কারণ এবং ইহাই বিদ্বেষের মূল। ভালকে ভাল বলে না, এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। প্রকৃত ভক্তের আদর সর্ব্বত্র। কিন্তু সেরূপ বিশ্বাস বা ভক্তের সংখ্যা অল্প। অনেক দিন পূর্ব্বে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "ব্রাহ্মদের মধ্যে এত দলাদলি বা ঘৃণা বিদ্বেষ দেখা যায় কেন?" আমরা বলিয়াছিলাম—"কেবল ভক্তগ্রন্থের অভাব অথবা বিশ্বাসহীনতা" ইহার কারণ। বিধাতায় অটল বিশ্বাস থাকিলে, বিধাতার সৃষ্ট জীবকে মানুষ কখনও ঘৃণা করিতে পারে না। তারপর, যাহাদের মস্তক এক বিশ্বাধিপ বিধাতার চরণে বিলুণ্ঠিত, এমন সম-বিশ্বাসীদের মধ্যে, প্রকৃত বিশ্বাস উদয় হইলে, বিদ্বেষ থাকা কখনই সম্ভব নয়। বিশ্বাসহীনতাই ব্রাহ্মদের সকল অধোগতির মূল। লোকেরা ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়ে এইজন্ত, নূতন দল বাঁধে এইজন্ত, ব্রাহ্ম পরস্পরকে ঘৃণা করে এইজন্ত, অপ্রেমে মরে এই জন্ত। খ্রীষ্ট বলিতেন—"তোমার যদি সর্ষপ কণার ন্যায়ও বিশ্বাস থাকে, পর্ব্বতকে বলিও তুমি স্থানান্তরিত হও, পর্ব্বত অমনি স্থানান্তরিত হইবে।" বিশ্বাসহীনতায় এ অমূল্য কথাকেও আমরা এখন কাল্পনিক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এই দেশব্যাপী বিশ্বাসহীনতা-প্রযুক্ত হিন্দুসমাজে একটা পুনরুত্থানের হাঙ্গামা উঠিয়াছে, এবং ব্রাহ্ম-সমাজে তাহার প্রতিবাদ চলিয়াছে। বিশ্বাসী ভক্ত কেশবচন্দ্রের তিরোধানে বঙ্গাকাশ শুষ্ক কঠোর অবিশ্বাসের ধূমে আচ্ছন্ন হইয়াছে, ব্রাহ্মেরা মারামারি কাটাকাটী করিয়া মরিতেছে। যে দোষ দেখাইতেছে, তাহার ঘাড় কামড়াইয়া খাইতেছে, কপটতার পূতিগন্ধময় পঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া মানুষ ধরিবার জন্ত ছুটিতেছে, কিন্তু নিজেরা "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" রহিয়াছে। হা ধর্ম্ম, তুমি কোথায়?

আমরা বলি, ব্রাহ্ম, লোক আসে বা না আসে, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, তুমি আগে দৃঢ়বিশ্বাসী হও, পৃথিবী কম্পিত হয় কি না, ধর্ম্মপ্রচার হয় কি না, পরযুগে ভাবিও। আমরা বিশ্বাসহীন, নির্ভরহীন, অভক্ত, আমাদিগকে জগৎ ভালবাসে না, ইহা কি বড় আশ্চর্য্যের কথা?

একান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই সকল কথা লিখিলাম। বিনীত নিবেদন, বন্ধুগণ ইহার ভিতরে কোন সত্য থাকিলে গ্রহণ করিবেন, না থাকিলে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। গভীর দুঃখে এসকল কথা লিখিলাম, বিদ্বেষভাবে নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্মধর্ম।

(১)

যুগধর্ম।*

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

শ্রীমদ্ভগবদগীতা,—৪র্থ অঃ, ৮।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিশেষ রূপ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, অবস্থা কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ক্রমাগত চক্রাকারে ঘুরিতেছে, তাহা হইতে নানা-রূপ অবয়ব বিকশিত হইয়া মানুষের নয়ন মনকে হরণ করিতেছে, অনন্ত বিভিন্ন রূপান্তরিত ভাব জগতের অনাবিল মঙ্গল সাধন করিতেছে। যে দিকে চাই, আমরা চক্রাকারে জগতকে কেবল ঘুরিতে দেখি। পৃথিবী যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে, এই পৃথিবীর অণু পরমাণুময় যাবতীয় পদার্থ, কোন্ কেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া, কে জানে, সেইরূপ প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক—

বঙ্গোপসাগরের অকূল অতলস্পর্শ নীল জলরাশি হইতে বাস্প উত্থিত হয়, সেই বাস্প মেঘে পরিণত হইয়া বসন্তের মলয় বায়ু ভরে হিমালয়কন্দরে নীত হয়। সেখান হইতে অজস্র বর্ষণ, ঝরণা ও নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া, প্রান্তর বন উপবনকে সরস করিয়া সাগর সঙ্গমে ধাবিত হয়। সাগর হইতে আবার জলরাশি বাস্প ও মেঘরূপে উত্তর সীমায় নীত হয়। জল রাশি বিভিন্ন অবস্থা ও রূপের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া যে সময়োপযোগী আশ্চর্য্য চক্র রচনা করিতেছে, ইহার দ্বারা পৃথিবীর কত উপকার হইতেছে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

উদ্ভিদ-জগতেও ঠিক এইরূপ চক্র পরিদৃষ্ট হয়। অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্ভব, সেই অঙ্কুর বৃক্ষরূপে পরিণত, শাখা প্রশাখায় শোভিত,

* এই বিষয় সম্বন্ধে রাঁচিতে ১৮৭৮ খ্রীঃ ৫ই মার্চ্চ ও কটকে ১৮৮০ খ্রীঃ ৫ই মার্চ্চ আমরা প্রকাশ্য স্থানে যে মৌখিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার ছায়া লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

ফুল ফলে ভূষিত। ফুল আবার ফল, ফল আবার বীজাঙ্কুর রাখিয়া লোপ পাইতেছে। বীজ মৃত্তিকায় পড়িয়া আবার নববৃক্ষ উৎপন্ন করিতেছে। এইরূপে এক হইতে ক্রমাগত অনন্ত সৃষ্টিতত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। কি এক আশ্চর্য্য চক্র ক্রমাগত ঘুরিয়া কার্য্য করিতেছে, দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া যাই।

জড়জগতে যে দৃশ্য, জীব-জগতেও তাহার ছায়া বা প্রতিচিত্র দেখা যায়। ভ্রূণ হইতে উদ্ভবের পর মনুষ্যের শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা ও আবার সন্তানোৎপত্তির পর জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন চক্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থার উদ্ভব হইলেই পূর্ব্ব অবস্থার তিরোধান হয়। একের অভ্যুদয়ে অন্যের অস্তিত্ব বিলোপ, সৃষ্টির নিয়ম। শিশুর মৃত্যু না হইলে বালকের অভ্যুত্থান হয় না, বালকের মৃত্যু না হইলে বৃদ্ধের জন্ম অসম্ভব, জলের মৃত্যু না হইলে বাষ্পের জন্ম অসম্ভব, ফুলের অন্তর্দ্ধান ভিন্ন বীজের উত্থান অসম্ভব।* এক জিনিসই বটে, কিন্তু—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত। সৃষ্টির কি আশ্চর্য্য কৌশল, বিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা। বার মাস, যে ঋতুর পর যে ঋতুর আগমন আমরা নিরীক্ষণ করি, ইহাও এই তত্বের পরিচয় দেয়। ঠিক একই সময়ে আম্র মুকুলের উদ্ভব, ঠিক একই সময়ে বর্ষার আগমন। কত বৎসর ধরিয়া চক্র ঘুরিতেছে, কিন্তু একবারও ভুল ভ্রান্তি নাই। প্রতিবার নবতত্ব, নব অবয়ব লইয়া জগতের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে। জগৎ নূতন চায়, তাই প্রতিনিয়ত সৃষ্টি নব বেশ ধারণ করিয়া বিধাতার অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রচার করিতেছে। অনন্ত বিঘূর্ণনে পৃথিবী অনন্ত উন্নতির দিকে তীব্র বেগে ছুটিয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মের ক্রমবিকাশই লিপিবদ্ধ করিব।

এই যে সৃষ্টি-চক্রের কথা বলিতেছিলাম, মহাত্মা ডারবিন আজীবন ইহারই আলোচনায় জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। অবস্থার পর অবস্থা, ঘটনার পর ঘটনা, কত অবস্থা ও কত ঘটনার পর্য্যায়ে বর্ত্তমান সুসভ্য

---

* "The new continents are built out of the ruins of an old planet, the new races fed out of the decomposition of the foregoing. New arts destroy the old." *Emerson.*

মানবজাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যাঁহারা পৃথিবীর মানব সম্প্রদায়কে চির উন্নতিশীল মনে করেন, তাঁহারা একথা স্বীকার করিবেনই যে, আদিম অবস্থার মানুষে আর এখনকার সুসভ্যতম মানুষে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। মানব জীবনে যেরূপ নানা অবস্থার পরিবর্ত্তন-চক্র ঘুরিতেছে, দেখিতেছি, মানব সমাজের উপর দিয়াও সেইরূপ এক মহা পরিবর্ত্তন-চক্র সীমাতীত কালকে আরম্ভ করিয়া ঘুরিতেছে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষ ও মানব-সমাজ ক্রমাগত উন্নতির দিকে ছুটিয়াছে। বিপর্য্যয়ের পর বিপর্য্যয়, ধ্বংসের পর ধ্বংস, বিলয়ের পর বিলয়—কত মহা বিলয়ের পর, কত যুগান্তব্যাপী ধ্বংসরাশির উপর বর্ত্তমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভাবিলে বিস্ময়ে ডুবিতে হয়। অসভ্যাবস্থা হইতে মানুষ সুসভ্যাবস্থায় পৌঁছিয়া, সম্মুখের উন্নত আদর্শ দেখিয়া, সেই অবস্থাকেও অসভ্যাবস্থা বলিয়া গণনা করিয়া আরো উন্নতির জন্য লালায়িত হইতেছে। দর্শন বিজ্ঞানের শেষ নাই, মানুষের উন্নতিরও বিরাম নাই। এইরূপে মানুষ ক্রমাগত ছুটিতেছে,—সে সদা অধীর, সে সদা চঞ্চল। কিছুতেই তার তৃপ্তি নাই। অনন্ত লক্ষ্য, তার পথ-প্রদর্শক; অনন্ত পিপাসা তার গতি-নিয়ামক। কিছুতেই তার পিপাসার নিবৃত্তি নাই। বংশপরম্পরায় উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশির উপর দণ্ডায়মান হইয়া মানুষ আরো জ্ঞানের জন্য লালায়িত হইতেছে। ধন-লালসা, বিদ্যার লালসা, প্রেম-লালসা, সুখ-লালসা, কোন লালসারই অন্ত নাই, শেষ নাই। কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান—সদা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনানুসারে উন্নতির দিকে ছুটিতেছে। মহাত্মা এমারসন ও কারলাইল—এই উন্নতির অবিশ্রান্ত গতি-চক্রের বিষয় ভাবিয়া, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, ভক্তি ভরে জগৎ-স্রষ্টার মহিমাগীতি গাইয়া গিয়াছেন। এই যে অনন্ত ক্রমোন্নতির দিকে জগৎ ছুটিয়াছে, ইহাকেই মহা পণ্ডিত ডাবিন বিবর্ত্তন-বাদ (law of evolution) নাম দিয়া সৃষ্টি-তত্ত্বের এক মহা সমস্যা উপস্থিত করিয়া, পৃথিবীতে যুগান্ত-ব্যাপী স্থায়ী প্রলয় তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই বিবর্ত্তনবাদের মত আমাদের দেশে, প্রাচীন আর্য্যভূমিতে বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের দেশের অবতার-তত্ত্ব—এই বিবর্ত্তনবাদের মতে পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষএক এক অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, আর অন্য অবতারের উদ্ভব হইয়াছে। অতি সামান্য অবস্থা, অতি সীমাবদ্ধ স্থান হইতে এই বিচিত্র ধন ধান্য পূর্ণ বর্ত্তমান উন্নত ধরার উদ্ভবে এই অবতার-তত্ত্বেরই সুন্দর শিক্ষা

লাভ করা যায়। প্রথমকার অবতার ত্রয়ে অবয়ব গঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। অবয়বের পূর্ণতার পর হইতে হিন্দু অবতারে শক্তি, জ্ঞান, প্রেমের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুর অবতারবাদে যে কি সূক্ষ্ম জ্ঞান, কি যুগ-তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ভাবিলে মোহিত হইয়া যাই। হিন্দুর অবতারবাদ সৃষ্টিতত্ত্বের আশ্চর্য্য কৌশলে পূর্ণ, মানব সমাজের ক্রমোন্নতির এক আশ্চর্য্য ইতিহাস বিশেষ। আর্য্যবর্ত্তের ন্যায় এরূপ ধর্ম্মের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আর কোথাও আছে কি না, জানি না।

সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও ভারতবর্ষের অবতার-তত্ত্ব বিশেষ রূপ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যুগের পরিবর্ত্তনানুসারে অন্যান্য পরিবর্ত্তনের ন্যায় ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। বেদের পর উপনিষদ, স্মৃতির পর পুরাণ, পুরাণের পর তন্ত্রের অভ্যুদয়ের ভিতরে ধর্ম্মজগতের ক্রমোন্নতির আশ্চর্য্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তন্ত্রের পর বৌদ্ধের মহানির্ব্বাণের জ্ঞানতত্ত্ব, তারপর শঙ্করের কর্ম্ম-কাণ্ডময় অনুষ্ঠানবাদ;—তারপর চৈতন্যের প্রেমের বিকাশ—অহেতুকি ভক্তির ঢলাঢলি ভাব। ভারতের অবতার-বাদের এই যে ক্রমোন্নতি বা বিবর্ত্তন দেখা যায়, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অতি সংক্ষেপে, অতি কৌশলে এই ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান কর্ম্ম, ভক্তি প্রেম—ধর্ম্মের পরিণতি;—ইহার তত্ত্ব গীতাতে অতি আশ্চর্য্য ভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম যুগ সকল অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান পূর্ণ।

এই যে মানব সমাজের ধর্ম্মের ক্রমোন্নতির কথা বলা হইল, ইহাতে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, পৃথিবী যদি উন্নতির দিকেই ক্রমাগত ধাবিত হইয়া থাকিবে, তবে যে ঈশ্বরকে পূর্ব্বে নিরাকাররূপে যোগী ঋষিরা ধ্যান করিতেন, তাঁহার আবার সাকার রূপ কেন কল্পনা হইল? একথার মীমাংসা আমরা এইরূপে করি, বেদের সময়ে অরুণ বরুণে মানুষ শক্তি কল্পনা করিত; তার পর উপনিষদের সময়ে তাঁহাকে জ্ঞান চক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু ধর্ম্ম আকাশ বা কল্পনায় রাখিয়া মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না। ঈশ্বরকে ব্যক্তি রূপে প্রাণে সর্ব্ব ঘটে, সকল অবস্থায় দেখিবার জন্য মানুষ তখন চেষ্টা করিতে লাগিল। আকাশের দেবতাকে তাই মানুষ গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিল, ও ব্যক্তির ন্যায় আপনার করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত পূজা করিতে শিখিল। এইরূপ হওয়াতে ধর্ম্ম যে ভারত সমাজের গৃহে গৃহে জমাট বাঁধিয়াছে, ইহাতে আমাদের একটুও সন্দেহ নাই। যে যে পথেই যাউক, মূলে লক্ষ্য সকলেরই

এক। কল্পনায়, ভাবে বা কার্য্যে পৌত্তলিকতা—ধর্ম্ম জগতের এক অবস্থার স্তর বিশেষ। এ স্তর ভেদ না করিলে জগৎ উন্নতিতে পৌঁছিতে পারে না। সাকারেও কিন্তু তখন মানুষ নিরাকার গুণ বা শক্তি ধারণা করিয়াছে। কেননা, প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হইলে কোন দেবদেবীর মূর্ত্তিই পূজ্য নয়। ইহাও মানব সমাজের এক উন্নতির অবস্থা। বর্ত্তমান সময়ের বর্ত্তমান আদর্শের চক্ষে এই উন্নতিকে অবনতির অবস্থা মনে করিয়া লইতেছি বটে, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিলে, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেই হইবে যে, ধর্ম্ম যদি এইরূপে ভারতসমাজে প্রতিষ্ঠিত না হইত, ভারতসমাজ দার্শনিকগণের নিরীশ্বরবাদের গাঢ়তর কালিমায় মলিন হইত। বিধাতার রাজ্যে চক্রের পর চক্র ঘুরিতেছে—যখন যাহার প্রয়োজন, তখন তাহাই উপস্থিত হইতেছে। তুমি কেহে ভণ্ড অবতার, বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া বিধাতার এক যুগের কার্য্যকলাপকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছ? জাননা কি যে, বিধাতা এখনও যেমন মানব সমাজের কল্যাণ বিধান করিতেছেন, তখনও সেইরূপ করিতেন? জাননা কি, পৃথিবীর বৈচিত্র্য তাঁহারই মহা ইচ্ছা-প্রসূত? জান না কি, বিধাতার ইচ্ছা ভিন্ন কোন ঘটনা বা কার্য্য জগতে শোভা পায় না? অবিশ্বাসী নাস্তিক স্থির হইয়া যুগ-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য চিন্তনে ক্ষণকাল আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর। অবস্থার বৈচিত্র্য, ঘটনার বৈষম্য বশতঃ উন্নতিকেও আমরা সময়ে সময়ে অবনতি রূপে কল্পনা করি বটে, কিন্তু বিধাতার রাজ্যে অবনতি কোথাও নাই।* তিনি মঙ্গলময়, আপন মঙ্গল ইচ্ছায় চিরকাল জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া আসিয়াছেন। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন যে, "যুগ পরম্পরায় মনুষ্য জাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্ম্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না যে, তাঁহার বিজ্ঞানও এই ধর্ম্মের এক অংশ, তিনিও একজন ধর্ম্মের আচার্য্য। তিনি যখন "Law" র মহিমা কীর্ত্তন করেন, আর আমি যখন হরি নাম করি, দুই জন একই কথা বলি।" (ধর্ম্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ, ৫৫ ও ৫৬ পৃষ্ঠা।) এই উন্নতির সোপান ধরিয়াই আমরা বর্ত্তমান উন্নতির যুগ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছি। মহাত্মা

* "One man's justice is another's injustice, one man's beauty another's ugliness, one man's wisdom another's folly, as one beholds the same objects from a higher point." *Emerson.*

রাজা রামমোহন রায় ষষ্টি বৎসর পূর্ব্বে যে মহা ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম্ম ভারতের যুগ ধর্ম্ম সমূহের সমন্বয়, চরম ফল বা পরিণতি। রামমোহন রায় মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উদ্ভূত হন নাই, বংশ পরম্পরায় সঞ্চিত উন্নতি-স্তম্ভের প্রতিকৃতি রূপে তিনি ভারতসমাজে দণ্ডায়মান হইয়া, বিধাতানুপ্রাণিত জ্ঞান-প্রতিভায়, বিশ্বপতির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তিনি আভাস দিয়া গিয়াছেন যে, জগতে যত ধর্ম্ম, যত কর্ম্ম, যত জ্ঞান, যত বিজ্ঞান, যত সত্য, যত পুণ্য, যত প্রেম, যত ভক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, সকলকে মিলাইয়া একীভূত না করিলে ধর্ম্মের মহিমা বা সম্মান রক্ষা হইবে না। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যে সকল মত ছিল, শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া তিনি সে সকলকে আবিষ্কার করেন এবং এক সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম বীজ রোপণ করেন। শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য এইরূপ বিভিন্ন অবস্থার সমষ্টির নামই যেমন মানব জীবন, পৃথিবীর আদি, মধ্য, বর্ত্তমান—সকল অবস্থার, সকল যুগের ধারাবাহিক আবিষ্কৃত সত্য রাশির উপরই সেইরূপ মানব ধর্ম্ম জীবন প্রতিষ্ঠিত। যে প্রাচীনকে উপেক্ষা করে, তার ন্যায় মূর্খ আর কে? আর যে বর্ত্তমানকে তুচ্ছ করে, তার ন্যায়ই বা চঞ্চলমতি আর কে? সকল কালে, সকল ঘটনায়, সকল অবস্থায় যে ব্যক্তি সেই কালাতীত মহাপুরুষকে না দেখিল, সে ধর্ম্মের বিধান-মহিমা কিছুই বুঝিল না। ভারতে ইংরাজের আগমন, বিধাতার ইচ্ছাপ্রসূত। ইংরেজ আগমনের পর হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ আগমনের পর হইতে পূর্ব্ব-গঠিত সংস্কার বা মত সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। পূর্ব্বের বিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছে,—সাকার দেবদেবীর উপাসনায় লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, লোক ধর্ম্ম ভুলিয়া, বিশ্বাস ভুলিয়া অসার বিলাস সুখেই জীবনের একমাত্র সম্বল করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ধরাকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতেছে, যখন নব যুগ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন বুঝিলেন, তখন তিনি আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। বিধাতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, মহা আন্দোলন, তিরস্কার, গঞ্জনা ও অত্যাচার মস্তক পাতিয়া লইয়া প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে গম্ভীরস্বরে প্রতিবাদ তুলিলেন। ধন্য মহাত্মা রামমোহন, ধন্য-ঈশ্বরের মহিমা। ভারতবর্ষে আবার নবযুগের আরম্ভ হইল, আবার নব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল।

লোকের স্বভাব এই, লোক নূতন কিছু দেখিলেই ভীত হয়, বিপদ গণনা করে। রামমোহনের মত প্রচারেও লোক সকল ভীত হইল। রামমোহনকে অশেষ প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে খণ্ডন করিবে! ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদ সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। শত সহস্র লোক এক উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে অন্য উপধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল, তাহার গতি থামিল। জয় জয় রবে, দিকদিগন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মত সকল প্রচারিত হইতে লাগিল। সকল শাস্ত্র, সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শন—জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম সকলই এই ধর্ম্মের অবলম্বন। মহাত্মা রামমোহনের ধর্ম্মবীজাঙ্কুর লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই ধর্ম্ম বৃক্ষকে আশ্চর্য্য সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যুগধর্ম্ম রূপে অবতীর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম, নব বিধানরূপে, জগতের কল্যাণের জন্য আপন প্রশস্ত বক্ষ জাতিসম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে পাপীতাপীর জন্য উদ্ঘাটিত করিলেন।

এইরূপ সার্ব্বভৌমিক উদার ভিত্তিতে যদি ইহা প্রতিষ্ঠিত না হইত, আমাদের সিদ্ধান্তানুসারে নির্দ্দেশ করা যাইত যে, ইহার পর আবার নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। আদি কাল হইতে যে সত্য আবিষ্কার হইয়াছে এবং অনন্ত কালে যে সত্য আবিষ্কৃত হইবে, তাহাই ইহার ভিত্তি। অনন্ত কালের অনন্ত শাস্ত্র, অনন্ত রচিত ও অরচিত বেদ বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেলের মার্জ্জিত সত্যরাশির উপর যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, এবং চির সুন্দর, চির নূতন বিধাতা ব্যক্তিরূপে যে ধর্ম্মের প্রাণরূপে বিদ্যমান, আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া দিতে পারি, সে ধর্ম্মের আর পতন নাই। যাহা পতন, তাহা উন্নতির সোপান, মহাত্মা এমারসন ও চ্যানিং বলিয়াছেন। এই ধর্ম্মের মধ্যে মতগত ভুল ভ্রান্তি থাকিলে, অনন্ত কালের প্রকাশিত সত্যরাশি দ্বারা সংস্কৃত ও মার্জ্জিত হইয়া আবহমান কাল মানবের কল্যাণ সাধন করিবে।

আজ হউক, কাল হউক, পৃথিবীর নর নারী সকলকেই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আজ হউক কাল হউক, এই ধর্ম্ম মতে সকলকে দীক্ষিত হইতেই হইবে। বাস্তবিক ধীর ভাবে বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যুৎবেগে এই ধর্ম্মের মত সকল জগতে প্রচারিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের দলাদলিতে, বিদ্বেষ ভাব-প্রসূত পরস্পরের নিন্দা প্রচারে, ও অগঠিত-চরিত্র ব্যক্তিগণের অধিনায়কত্বে এ সমাজের হীনাবস্থা উপস্থিত

হইতেছে, সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া, ধর্ম্মের সিংহাসনে বিধাতাকে নিয়ন্তারূপে না বসাইয়া আপনারা উপবিষ্ট হইয়া অহঙ্কার-দাস রূপে রাজ্যশাসনের চেষ্টা ও অন্তকে ঘৃণা করিতেছেন বলিয়া এই সমাজের অধোগতি হইতেছে বটে, সন্দেহ নাই; নবীন বয়সের উত্তেজিত ভাব-পরিচালিত ও উষ্ণ-শোণিত-চালিত নেতাগণের অহংসর্ব্বস্ব-জ্ঞান-প্রচারে এই সমাজ পতনের দ্বারে উপস্থিত হইতেছে, সত্য; কিন্তু বিধাতা আপনি যুগধর্ম্মের অবতার হইয়া যে ধর্ম্মের ললাটে আপন বিজয় নিশান প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সে ধর্ম্মের আর পতন নাই। চির উন্নতি, ক্রমোন্নতি—ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য এবং ভিত্তি। আমাদের ন্যায় চরিত্রহীন শত শত লোকের অহঙ্কার-প্রসূত ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা বিস্মৃতির অতলস্পর্শ সাগরে বিলীন হইয়া যাইবে, কিন্তু বিধাতার ধর্ম্ম চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এ ধর্ম্মের নেতা, গুরু, পরিচালক, প্রচারক স্বয়ং বিশ্বপতি, বিশ্বাধার। যিনি যুগে যুগে নব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, মানবের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তিনিই জগতের অসংখ্য ধর্ম্মের সমন্বয় বা মিলনের জন্ম এই ধর্ম্মকে নবভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। জয় তাঁহারই, কেননা তিনিই ইহা দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতেছেন।

মানুষ নাকি অহঙ্কারের দাস, তাই মানুষ বিধাতার মহিমা প্রচার না করিয়া নিজের মহত্ত্ব প্রচার করিতে সদা লালায়িত। বৎসরান্তে ব্রাহ্মসমাজের উৎসব-গৃহে তাই দেখি, দুটী দশটী অপোগণ্ড শিশুর কণ্ঠে নবফুলমালা পরাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব গুরু যে কোটি কোটি মানুষকে তাঁর ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন, অবিশ্বাসী মানুষ তাহা কিছুতেই বুঝিবে না। দুই পাঁচজন লোককে দীক্ষিত করিয়া মানুষ কেবল নিজের মহত্ত্ব ঘোষণায়ই ব্যস্ত! অহো দুর্ভাগ্য, কি বিড়ম্বনা! মানুষ আপনি ভাল হইবার জন্ত চেষ্টা না করিয়া, সৎ না হইয়া কেন যে পরচিন্তায় কাতর হয়, বুঝি না। মানুষ নিজে সৎ হও, চরিত্রবান্ হও। বিধাতার ধর্ম্ম তিনিই প্রচার করিবেন, তিনি স্বয়ং মানুষকে দীক্ষিত করিবেন, ধরিবেন। তোমার আমার সে চিন্তায় ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। বিধাতার অনুগত হইয়া অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁর আদেশমত সৎপথ ধরিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও। পতন অসম্ভব।

বিধাতার ধর্ম্ম যে বিধাতা স্বয়ং প্রচার করিতেছেন, তার এক উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে যে সমাজের যে নেতার ধর্ম্ম মত পাঠ করি, দেখি, তার মধ্যেই যুগধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের আভাস রহিয়াছে। পাশ্চাত্য খ্রীষ্ট সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান উত্থানকারী নব হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণের নব ধর্ম্ম ব্যাখ্যা—সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিষ্কার মত সকল রূপান্তরিত বা নামান্তরিত অবস্থায় প্রচার করিতেছে। এক সময়ে বড় আক্ষেপ ছিল, আমাদের দেশের জাতীয় সাহিত্য কেন নিরীশ্বরবাদে পূর্ণ থাকে? বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ দলের ধর্ম্মের প্রতি ঔদাস্ত ভাব ও আর্য্যদর্শনের যোগেন্দ্রনাথ-প্রমুখ দলের নিরীশ্বরবাদ ঘোষণায় একদিন মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম্মভাব প্রবিষ্ট না হইলে জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব ইহা ভাবিয়া এই অধম অজ্ঞানের ক্ষীণ লেখনী ধর্ম্মভাব মূলক দুই চারি খানি উপন্যাস ও প্রবন্ধ পুস্তক লিখিয়াছিল। দেখিতে না দেখিতে বিধাতার ইঙ্গিতে জাতীয় সাহিত্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইল, বঙ্কিমচন্দ্রের নূতন উপন্যাস সকল পরিষ্কার ধর্ম্মের ছায়ায় চিত্রিত হইয়া বাহির হইল, মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মচিন্তায়, ধর্ম্ম সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিধাতা পতিত বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি এত কৃপা বর্ষণ করিলেন যে, যোগেন্দ্র নাথের কঠোর হৃদয় ধর্ম্মের কোমল মধুর নামে পরিপূর্ণ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র—এই সকল সাহিত্য-সেবক এখন ধর্ম্মের বিশ্বাসে গদগদ-চিত্ত, ভক্তি প্রেমে মাখা, ইহা ভাবিলেও হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। যে দিন মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারে ঘোষণা করিলেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মেরই* শাখা মাত্র" এবং "শশধর তর্ক চূড়ামণি যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, আমাদের মতে তাহা কখনই টিকিবে না"†। সেই দিনই বুঝিলাম, মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করুন আর নাই করুন, প্রচারে ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রথম ভাগে তিনি যে অমূল্য ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন, তাহা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের চিরপ্রচারিত মত, আমরা ক্রমে তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইব। তিনি গীতার ভিতর দিয়া বর্ত্তমান উজ্জ্বল ধর্ম্ম মতে উপস্থিত হইয়াছেন। গত বৎসর (১২৯৫ সালে) এই ধর্ম্মতত্ত্ব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহার লিপিবদ্ধ মত সকল দীর্ঘকাল যাবত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রচা-

* প্রচার—শ্রাবণ ১২৯১, ২১ পৃষ্ঠা।

† প্রচার—শ্রাবণ ১২৯১, ১৫ পৃষ্ঠা।

ন্নিত হইয়াছে। তাঁহার এই মত প্রচারে বঙ্গদেশ যে ধন্য হই-য়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? শিষ্য যখন প্রশ্ন করিতেছেন—"আপনার এরূপ হিন্দুয়ানীতে কোন হিন্দু মত দিবে না।" তখন গুরুবেশে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিতেছেন—"না, দিক, কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম।" ধর্ম্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ ১৩২ পৃষ্ঠা। "যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি হয়, শারীরিক মানসিক, এবং সামাজিক, সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়; তাহাই ধর্ম্ম। * * *। যাহা ধর্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহা-ভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।"

"একথায় দুইটী গোল ঘটে। প্রথম, বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম্ম আছে বা থাকিতে পারে, একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শুনিলে অনেকে কাণে আঙ্গুল দিবেন। এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা লিখিতেছি না। * * * আর একটী গোলযোগ এই, হিন্দু শাস্ত্রের কোন্ কথা সত্য, কোন্ কথা মিথ্যা, ইহার মীমাংসা কে করিবে? উত্তর, আপনারাই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। সত্যের লক্ষণ আছে। যেখানে সেই লক্ষণ দেখিব, সেইখানেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিব।" *

ধন্য বঙ্কিমচন্দ্র, ধন্য তোমার সাহস, ধন্য তোমার ধর্ম্ম বিশ্বাস। তোমার লেখনীকে চিরকাল পূজা করিয়া আসিয়াছি, আজ তোমার ধর্ম্ম-তৃষিত হৃদয়ের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিতে বাহু প্রসারণ করিয়াছি। তুমি তোমার ধর্ম্মের যে নাম দেও না কেন, আমরা বুঝিতেছি, তুমি সামঞ্জস্যের ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রূপে আবির্ভূত হইয়াছ। তোমাকে ভক্তির সহিত বারম্বার প্রণাম করিতেছি। বিধাতা তোমার মঙ্গল করুন।

(২)

মতের সামঞ্জস্য।

আমরা প্রথম প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছি, ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস স্থিরচিত্তে অধ্যয়ন করিলে নিশ্চিতরূপে ধারণা হইবে যে, পৃথিবীর অবস্থার উন্নতির সহিত ধর্ম্মের নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—যখন যেরূপ প্রয়োজন,

* প্রচার—শ্রাবণ ১২৯১।

এই পৃথিবীতে যেন তাহাই হইয়াছে—যুগে যুগে নবধর্ম্ম অভ্যুত্থিত হইয়া নরনারীর হৃদয়ে শান্তিবর্ষণ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিতেছি, ইহাও যে যুগধর্ম্ম, তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছি। দেখাইয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে যত ধর্ম্মমত প্রচারিত হইতেছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বল মত সকলেরই পোষকতা করিতেছে। ধর্ম্ম এক অবিনশ্বর জিনিস,—কখনও ইহার বিনাশ হয় নাই, কখনও হইবে না। যতদিন মানুষ, ততদিন এই ধর্ম্ম জগতে আছে, ছিল ও থাকিবে। ধর্ম্ম, মতে পৃথক্ পৃথক্ বটে, কিন্তু মূলে এক, বিশ্বাস ও ভক্তিতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে কোন পার্থক্য নাই। ধর্ম্মের মত-বিভাগে যথেষ্ট কলহ বিবাদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু খাঁটী বিশ্বাস ভক্তিতে কলহ বিবাদ নাই। পৃথিবী ক্রমে এই কথার সারবত্তা অনুভব করিতেছে, এবং ধীরে ধীরে এই উদারভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইতেছে, ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নাই—ধর্ম্মও এক ভিন্ন দুই নাই। কালে সকল ধর্ম্ম মিলিয়া যে একাকার হইবে, তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড ক্রমে ধর্ম্মের এক অত্যাশ্চর্য্য সার্ব্বভৌমিক উদার ভিত্তিতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। যিনি যে ভাবে যে ধর্ম্ম প্রচার করুন, সকলের ভিতরেই সূক্ষ্মভাবে যোগ বা মিল দেখা যাইতেছে। পৃথিবীর পক্ষে ইহা যে অতি শুভলক্ষণ, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়াছি, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মত প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, সম্প্রতি মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র সেই মতই নামান্তরে প্রচার করিতেছেন। নামে কিছু আসিয়া যায় না, জিনিস এক হইলেই হয়। জিনিস এক কিনা, সে কথার বিচার করিতেছি।

মহাত্মা চৈতন্যদেবের ধর্ম্মান্দোলনের পর বঙ্গপ্রদেশের ধর্ম্মবিভাগে, যুগান্তর উপস্থিত হয়। সে সকল তত্ত্বের বিশেষ আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। তবে এ কথা না বলিলে চলে না যে, চৈতন্যের অহেতুকী ভক্তি প্রচারের পর, বঙ্গপ্রদেশের কর্ম্মবিভাগ কিছু শিথিল হইয়াছিল। এই সময়ে অনেক লোকই ইংরাজের সহবাসে আপনাদিগকে হীন-চরিত্র মনে করিতেছিল, কাজেই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। মহাত্মা রামমোহন এই গতি ফিরাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিলেন। ইংরাজি শিক্ষার বহুল প্রচারে, বিধাতার কৃপায়, বঙ্গপ্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় নূতন আলোক পাইলেন। রামমোহন এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণার্থী অনেক লোকের মনের গতি

করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং চরিত্র সম্বন্ধে অনেকের নানারূপ মতদ্বৈধ আছে, কিন্তু একথা এই দীর্ঘকাল পরে সকলেই স্বীকার করেন যে, একেশ্বরবাদ প্রচারই রাজার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এবং তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। রাজার প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম কালসহকারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ভক্ত কেশবচন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ প্রতিভায় এবং গভীর সাধন ভজনে নুতন কলেবর ধারণ করিয়া বঙ্গদেশের নরনারীর আশার কারণ হইল। ধার্ম্মিক হইতে হইলে চৈতন্যের ন্যায় গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই প্রচলিত মত-দুর্গের মধ্য হইতে গভীর স্বরে এই ধ্বনি উত্থিত হইল, "এই সংসারই ধর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত স্থল, গৃহ পরিবারই ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র। এই সংসার-শিক্ষালয়ে, আপনাকে জয় করিয়া, ঈশ্বর-প্রদত্ত সকল শক্তির উৎকর্ষ বিধান ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই ধর্ম্ম। ঈশ্বর নিগুর্ণ নহেন, তিনি সগুণ। তিনি পিতা মাতার ন্যায় মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মানবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে বৃত্তি-সকলের উৎকর্ষ সাধন করা চাই। সমঞ্জসীভূত উন্নতি লাভ করিলেই মনুষ্যত্ব এবং ঈশ্বরকে লাভ করা সহজ হয়।"

যাঁহারা মহাত্মা থিওডোর পার্কারের গ্রন্থাবলী, বিজ্ঞ অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্মনীতি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান এবং ভক্ত কেশবচন্দ্রের সমস্ত উপদেশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, শারীরিক বৃত্তি, মানসিক বৃত্তি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম—এ সকলের উৎকর্ষ বা অনুশীলন (Simultaneous development) ভিন্ন মনুষ্যত্ব জন্মে না। মনুষ্যত্ব লাভ ভিন্ন ধর্ম্ম লাভ অসম্ভব। ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর, ব্যক্তি রূপে, পিতা মাতারূপে দীর্ঘকাল প্রচারিত হইয়া আসিয়াছেন, ইহাও সকলেই জানেন। এ সকল তত্ত্ব ব্রাহ্মসমাজের বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই জানেন, সুতরাং সে সকলের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। এ সকল কথা শত শত স্থানে শত শত বার উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং বিস্তৃত আলোচনারও প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্ম্মমত প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ঠিক ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত ধর্ম্মমতের অনুরূপ। তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের প্রথম ভাগে যে সকল তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, শিষ্য সংক্ষেপে তাহার সার এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মত গুরু কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

শিষ্য গুরুকে বলিতেছেন—

১। "মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে, আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেই গুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

৫। এই সমস্ত বৃত্তি উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরের ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশ প্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই-প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশ প্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।" ধর্ম্মতত্ব, প্রথম ভাগ, ৩২৭ পৃষ্ঠা।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া গুরু বলিলেন, "তবে তুমি অনুশীলনতত্ব বুঝিয়াছ।" ৩২৮ পৃষ্ঠা।

এই সকল কথা ধর্ম্মতত্বে অতি বিস্তৃত রূপে এবং বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনুশীলন অর্থে (Culture) অর্থাৎ উৎকর্ষ সাধন। তিনি বলেন, (The substance of Religion is Culture) "মানব বৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।" ধর্ম্মতত্ব, ২৬ পৃষ্ঠা।

সকল বৃত্তির উৎকর্ষ ভিন্ন যে ধর্ম্ম লাভ হয় না, হইতে পারে না, বঙ্কিমবাবু অতি পরিস্ফুটরূপে তাহা এই গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বৃত্তি সকলকে (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জ্জনী, (৩) কার্য্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী, এই চারি বিভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সংসার-বিদ্যালয়ে এই সকলের উৎকর্ষ সাধন করিলেই মানুষ ধর্ম্মের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়। বৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন ভিন্ন যে ধর্ম্ম লাভ হয় না, নিম্নলিখিত কথায় তিনি তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(১) "আর যে সদ্বৃত্তিগুলির অনুশীলন অভাবে অপক্কাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন সুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর

যে কেবল অসদ্বৃত্তিগুলি স্ফূরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ। * * * হিন্দুধর্ম্ম মানি, হিন্দুধর্ম্মের 'বখামি' গুলা মানি না। আমার শিষ্যদিগকেও মানিতে নিষেধ করি।" ৮২ পৃষ্ঠা।

(২) "আর আজকাল যোগধর্ম্মের একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে সুমহৎ ফল আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে যাঁহারা এই হুজুগ লইয়া বেড়ান, তাঁহাদের মত এই দেখিতে পাই যে, কতকগুলি বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ—ইহাই যোগের উদ্দেশ্য। এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য ধর্ম্ম হয়, তবে তাহাদিগের এই ধর্ম্ম অধর্ম্ম। বৃত্তি নিকৃষ্টই হউক বা উৎকৃষ্টই হউক, উচ্ছেদ মাত্র অধর্ম্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্ম্মিক, কেননা তাঁহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্ম্মিক, কেননা তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন।" ৫৪ পৃষ্ঠা।

(৩) "যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম্ম। * * * প্রথম ধর রোগ। রোগ ধর্ম্মের বিঘ্ন। * * রোগ কর্ম্মীর কর্ম্মের বিঘ্ন, যোগীর যোগের বিঘ্ন, ভক্তের ভক্তি সাধনের বিঘ্ন। রোগ ধর্ম্মের পরম বিঘ্ন। এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রথমতঃ রোগের কারণ।" ৮৭,৮৮ ও ৮৯ পৃষ্ঠা।

"শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন।' ৯১ পৃষ্ঠা

(৪) "আমি বলিয়াছি, শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামনা করা অধর্ম্ম। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজন, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন, ধর্ম্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে।" ১০০ পৃষ্ঠা

(৫) "এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এদেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এদেশে বাঙ্গা-

লিয়া অমানুষ হইতেছে, তর্ককুশল, বাগ্মী বা সুলেখক,—ইহাই বাঙ্গালির চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহার প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থ-গৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণ-প্রিয় পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দুর্ব্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকল গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যযোগ্য যে বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন, তাহাই মঙ্গলকর, সেগুলির অবহেলা আর বুদ্ধি বৃত্তির অসঙ্গত স্ফূর্ত্তি মঙ্গলদায়ক নহে।" ১১০ ও ১১১ পৃষ্ঠা।

(৮) 'যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব। * * * * ঐ মহাত্মা (কেশবচন্দ্র সেন) সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।" ১৩২ পৃষ্ঠা।

এইরূপ সকল বৃত্তির কথা সম্যকরূপ আলোচনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন;—

"যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তি গুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্য সাধনে, ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে, এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে।" ১৪১ পৃষ্ঠা।

এই ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইবার জন্ত তিনি গীতার আশ্রয় লইয়াছেন। সে সকল কথার আলোচনা এ প্রবন্ধে থাকুক। বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্ত তিনি যে উদার ও গভীর চিন্তাপূর্ণ কথা বলিয়াছেন, তাহার সহিত ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারিত সমস্ত মতের (আমরা ব্রাহ্মসমাজের মত বুঝিতে যদি ভুল করিয়া না থাকি) ঐক্য দৃষ্ট হয়। ১০২ পৃষ্ঠায় মদ্যপান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। শীত প্রধান দেশে, বা অন্ত দেশে শৈত্য-

থিক্য নিবারণ জন্য ব্যবহার হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে—ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট নহে। কিন্তু একটি এমন অবস্থা আছে যে, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার।" অর্থাৎ "যুদ্ধ", "যুদ্ধকালে মদ্যসেবন করা ধর্ম্মানুগত বটে।" শেষোক্ত মতের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মতের মিল নাই। যুদ্ধ যে ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য নয়, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের মত। পৃথিবীতে প্রকৃত ধর্ম্মের আধিপত্য সংস্থাপিত হইলে, যুদ্ধ যে উঠিয়া যাইবে, পৃথিবীর সকল ধার্ম্মিকদিগের ইহাই বিশ্বাস। বঙ্কিমবাবু বিশ্বপ্রীতিমূলক ধর্ম্ম-প্রচারের সময় নরশোণিত-পাতের আবশ্যকতা, বিনা যুক্তি প্রদর্শনে, কেন যে সমর্থন করিলেন, বুঝিলাম না। এ সম্বন্ধে তাঁহার স্তায় বিজ্ঞ ব্যক্তিকে ভ্রমে পতিত দেখিয়া আমরা যারপর নাই দুঃখিত।

যা'ক্। তাঁহার অন্যান্য মত আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি, তাহাতে বড় অনৈক্য পরিদৃষ্ট হইল না। তিনি হিন্দুধর্ম্মকে সংস্কার করিতে প্রয়াসী, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যও তাই। তিনি ঈশ্বরকে যেরূপে প্রচার করিতে চাহেন, ব্রাহ্মসমাজও সেইরূপে প্রচার করিতেছেন। তাঁহার ভাষা এই ;—

"ঈশ্বরই সর্ব্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এই জন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে, ধর্ম্ম সম্যক ধর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, কেননা, যিনি নির্গুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদিদিগের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" চৈতন্য অথবা যাহাকে হার্বর্টস্পেন্সর "Inscrutable power in Nature" বলিয়া ঈশ্বর স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্ম্মের মূল, কেননা তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে "Impersonal God" বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল, যাঁহাকে "Personal God" বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।" ৩৪ পৃষ্ঠা। কি উদার মত!

ঈশ্বরের উপাসনার প্রয়োজন কি? এই কথার উত্তরে তিনি বলিতে-

ছেন—"ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা। তবে বেগারটালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে;—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদের চরিত্রে পড়িবে। * * * অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ঈশ্বরের নিকট হইব। * * মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শনীতি ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি।" ৩৫ পৃষ্ঠা।

ঈশ্বর অনন্ত, তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। মানুষ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? এ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু বলেন;—"যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন।" * * জনক, নারদ, বশিষ্ঠ, শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ প্রভৃতি মহাজনেরা মানুষের আদর্শ।" সর্ব্বোপরি, তিনি বলেন, "হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়, যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, * * ইত্যাদি * * তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।" ৩৭।৩৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য মহাজনদিগকে বঙ্কিমবাবু যে ভাবে গ্রহণ করিতে-ছেন, সে ভাবে গ্রহণ করিতে ব্রাহ্মসমাজের কোন আপত্তি নাই, এবং একথা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সেভাবে মহাজনদিগকে গ্রহণ করিতে ও ভক্তি করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা অনেকে সেরূপ ভাবে ভক্তি করিয়া থাকেন।

সকলেই অবগত আছেন যে, কেশবচন্দ্র 'সচ্চিদানন্দ' ব্রহ্মের উপাসনা অতি সূক্ষ্মভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বেদের ধর্ম্ম, উপনিষদের ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, এ কোন ধর্ম্মেই হিন্দুজাতির পিপাসা মিটে নাই বলিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপিত হইল। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন—

"এই তিন ধর্ম্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা, এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম্ম হইবার উপযুক্ত।" ৩১৯ পৃষ্ঠা।

ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাও এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসক। ব্রাহ্মধর্ম্মই যে জাতীয় যুগধর্ম্ম, পৌরাণিক ধর্ম্মের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হউক, আর যাহাই হউক, সে বিষয়ে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমবাবু প্রশ্নোত্তরে আরো পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন—"হিন্দুধর্ম্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে—ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই। এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য্যময়। তিনি যদি সগুণ হয়েন, তবে তাঁহার সকল গুণই আছে, কেননা তিনি সর্ব্বময় এবং তাঁহার সকল গুণই অনন্ত। অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণ বিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। তিনি মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন এবং নির্ব্বিকার। এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য্য, তাঁহাও তাহাতে অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? অতএব বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির, ভক্ত্যাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্ম্মের যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।" ৩১৯ ও ৩২০ পৃষ্ঠা।

আর তুলিবার প্রয়োজন নাই। ইহাতেই প্রতীয়মান হইবে যে, বঙ্কিম-বাবু যে উদার ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন, তাহাই নামান্তরে ব্রাহ্মধর্ম্ম। বঙ্কিম বাবু এই ধর্ম্মতত্ত্বে যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমরা অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তিনি স্বাধীন ভাবে, সাম্প্রদায়িকতার উপরে উঠিয়া, হিন্দুধর্ম্মের যে পবিত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সকলেই মোহিত হইবেন। বঙ্কিমবাবুর এই ধর্ম্ম মত প্রচারে আমরা যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলিতে পারি না।

ভক্তি।

ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশে বঙ্কিম বাবুর ঘনীভূত ধর্ম্ম চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি, সাধারণতঃ বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মমত ও ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্মমত একই রূপ। কিন্তু ভক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু যে সকল অমূল্য কথা বলিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে তাহার অতি অস্ফুট ব্যাখ্যা মাত্র শুনিয়াছি। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যায়, তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ, সূক্ষ্ম দর্শন, গভীর চিন্তা ও গবেষণার উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভক্তিতত্ত্বের এমন বিশদ ব্যাখ্যা আর কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ভক্তিকে তিনি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,—মনুষ্যে ভক্তি ও ঈশ্বরে ভক্তি। তিনি বলেন, মনুষ্যে ভক্তি তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, (৩) সমাজশিক্ষক। এতদ্ভিন্ন ধার্ম্মিক, রাজকর্ম্মচারী, বয়োজ্যেষ্ঠ বা গুণী ব্যক্তিও সমাজ, এ সকলকেও ভক্তি করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশ একরূপ ভক্তিহীন হইয়াছে, বলিতে হইবে, এমন কি, পিতা মাতার প্রতিও এখন লোকের ভক্তি নাই। এই সময়ে এই পুস্তক দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইবে। বঙ্কিম বাবু অযথা ভক্তি প্রয়োগের খুব বিরোধী। ব্রাহ্মণজাতির ন্যায় প্রতিভাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক জাতি পৃথিবীর মধ্যে দুর্লভ। পরহিতে এই জাতির জীবন উৎসর্গ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে দিন আর নাই। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালী খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?"

"গুরু বলেন।—কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।"

এই কথায়, বঙ্কিম বাবু যে অযথা ভক্তি প্রয়োগের বিরোধী, তাহা উত্তম রূপ বুঝা যাইতেছে। এই সুখ শোভা, এই স্ত্রী পুত্র কন্যা ও ভাই বন্ধুপূর্ণ সংসার একটী বিদ্যালয় বিশেষ। এখানকার নরনারীকে যে ভক্তির চক্ষে না দেখিতে পারে, সে ভগবানকে ভক্তি করিতে পারে না। অযথা ভক্তি প্রয়োগ নীতি-বিরুদ্ধ কথা, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে ভক্তি অর্পিত না হইলে মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। এখন লোকে গুরুজনকে অবহেলা করে, রাজাকে ভয় করে, ভক্তি করে না, সমাজ-শিক্ষককে তুচ্ছ জ্ঞান করে। বঙ্কিম বাবু দেশের অবস্থা এই রূপ চিত্র করিয়াছেন—"ভক্তি, যাহা মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন "My dear Father"—অথবা বুড়ো বেটা। মাতা বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত, চালকলা-লোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন,—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহবা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মী স্বরূপা মনে করিতে পারি না, কেননা লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজ-পুরুষ, অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমাজ-শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিদ্রূপের স্থান। ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধার্ম্মিককে "গো বেচারা" বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই।" ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশের এই শোচনীয় অবস্থা যতদিন, ততদিন এ দেশের মঙ্গল নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা স্বাধীনতার লক্ষণ। যে স্বাধীনতা পূজ্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে নিষেধ করে, সে স্বাধীনতা যত শীঘ্র কর্ম্মনাশার জলে প্রক্ষিপ্ত হয়, ততই মঙ্গল। গুণী ও মহৎ লোককে পূজা করিতে না শিখিলে কখনও কোন জাতি মহৎ হয় না। মহাপুরুষের আদর যে দেশে নাই, সে দেশ ঘোরতর স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতায় নিমগ্ন। ইংলণ্ড বড় কিসে, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরে এক কথায় এই বলিতে পারি, মহৎ লোকের ভক্তি ও পূজাতে ইংলণ্ড বড়। ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া সব সময়ে মানুষ জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারে না, এই জন্য মহাপুরুষের সৃষ্টি। মহাপুরুষদিগের পদানুসরণ না করিলে, সাধারণ মানুষ, কি নীতিতে, কি ধর্ম্মে, মহত্ত্ব লাভ করিয়া কখনও বড় হইতে পারে

না। খ্রীষ্ট বা মহম্মদ, চৈতন্য বা বুদ্ধ, কবীর বা নানক, হাওয়ার্ড বা ম্যাট-সিনি,—ইহাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ যদি পৃথিবীর সম্মুখে না থাকিত, তবে পৃথিবী কখনও এত উন্নত হইতে পারিত না। ইহাদের জীবন-ছায়া সমাজে ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হইয়া কত মানুষকে দেবত্বে লইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশ এখন স্বাধীনতা চায়,—তাই নাকি আপন আপন মহত্ব লইয়াই সকলে ব্যতিব্যস্ত। যে ইংলণ্ডের স্বাধীনতার ধুয়া এ দেশকে এই হীনাবস্থায় উপস্থিত করিতেছে, সেই ইংলণ্ডের লোকেরা বড় লোককে কিরূপ সম্মান করে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। 'আমি গ্লাডোষ্টোন সাহেবের দলভুক্ত' এই কথা বলিতেও ইংলণ্ডের লোকেরা গৌরব মনে করে। ডার্বিতে গ্লাডোষ্টোন সাহেবের অশীতি জন্মোৎসব উপলক্ষে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী-সমাজের অন্যতর সভ্য মহাত্মা সার ডবলিউ হারকোর্ট সাহেব গৌরবের সহিত বলিয়াছিলেন :—

"That is the man and that is the spirit in which we are led, that is the man, and that is the spirit in which we will follow him to the end. Whilst life remains with him we will follow in his steps, and when he is no more we will endeavour to follow his example"

'যতদিন তিনি জীবিত আছেন, ততদিন তাঁহার পদানুসরণ করিব, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আদর্শ ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিব।" মহাত্মা হারকোর্টের ন্যায় একজন স্বনাম-খ্যাত ব্যক্তিও গ্লাডোষ্টোন সাহেবকে এত মান্য করেন। বিলাতে এইরূপ যে কত দৃষ্টান্ত আছে, তাহার শেষ নাই। বিলাত স্বাধীন, না ভারত স্বাধীন?

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ মহত্তের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু নব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মহাপুরুষের বিরোধী, অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লীলাস্থল। কেশবচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া, সাধারণ সমাজের অধিকাংশ সভ্য, ঘৃণার চক্ষে না দেখেন, এমন মহাপুরুষ জন্মে নাই। দেশের বড় লোকেরা সকলেই কৃপার পাত্র। কলেজের ছাত্রগণও প্রপিতামহদিগের শ্রাদ্ধের পিণ্ড, সমালোচনার খরতর স্রোতে অকুতোভয়ে ভাসাইয়া দিয়া বাহাদুরি দেখাইতেছেন! "আমি ভিন্ন আর কেহ বড় নাই, আর সকলেই মূর্খ," এই কথাই যেন এখন সকলের প্রাণগত ভাব। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মানুষকে ভক্তির চক্ষে দেখা,

সাধারণের ব্রত নয়, ঘৃণা করাই যেন এখন ব্রত। প্রেম নামক যে একটা অতি পূজ্য জিনিসের কথা এ জগতে শুনা গিয়াছে, তাহা দিন দিন সমাজে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। বঙ্কিম বাবু এ দেশের ভক্তি-হীনতার যে ছবি আঁকিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের ছবিও ঠিক তাহার অনুরূপ। দেশের আশা কোথায়, কে বলিতে পারে ?

মানুষকে বাইবেলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বলা হইয়াছে। একথা সকলে অভ্রান্ত রূপে বিশ্বাস নাও করিতে পারেন, কিন্তু মানুষ যে ঈশ্বরের হাতের জিনিস, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? ঈশ্বরের হাতের জিনিসকে ভক্তি না করিয়া, ভাল না বাসিয়া যে ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে ধাবিত হয়, তাঁহার সে কামনা যে কখনও পূর্ণ হইবে না, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মানুষ সাকারকে ভক্তি করিতে পারিল না, নিরাকারকে ভক্তি করিবে ?—ইহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় কল্পনার ভেল্কি মাত্র।

ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বঙ্কিম বাবু এই উপদেশ দিয়াছেন—"যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।" সংক্ষেপে ইহা অপেক্ষা ভক্তির আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হইতে পারে না। মানুষের সকল বৃত্তির অনুশীলনই যে ভক্তির অন্তর্গত, ইহা অতি পরিষ্কার রূপে বঙ্কিম বাবু বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্মে যে ভক্তি নাই, একথা বুঝাইয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, উপনিষদে একটু মাত্র ভক্তির আভাষ পাওয়া যায়। ভক্তিমার্গের প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য কি শ্রীকৃষ্ণ, এ বিষয়ে তিনি স্থির মীমাংসা করিতে পারেন নাই। ভগবদ্গীতা হইতে তিনি ভক্তি-যোগ সুন্দররূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতা, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্যের উজ্জ্বল গ্রন্থ। গীতা, যুদ্ধ শাস্ত্রের নীতি, ধর্ম্মনীতি নহে, এ সম্বন্ধে প্রচলিত যে একটা কুসংস্কারপূর্ণ মত আছে, সেটাকে খণ্ডন করিয়া বঙ্কিম বাবু কর্ম্ম ও জ্ঞান যোগে বুঝাইয়াছেন। ভক্তির প্রথম সোপান নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার উপদেশ অতি উদার, অতি উচ্চ।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্ব কর্ম্মণি।' ২।৭

অর্থাৎ, "তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কদাচ কর্ম্মফলে যেন না হয়। কর্ম্মের ফলার্থী হইও না, কর্ম্ম ত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক।"

"অর্থাৎ, কর্ম্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্খা করিবে না।

এ সম্বন্ধে গীতার পর চরণে উক্ত হইয়াছে—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণিসঙ্গংত্যক্তাধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

"কর্ম্ম করিবে, কিন্তু কর্ম্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে। তোমার যতদূর কর্ত্তব্য, তাহা তুমি করিবে। তাতে তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকে ভগবান যোগ বলিতেছেন। এই রূপ যোগস্থ হইয়া, কর্ম্মে আসক্তি-শূন্য হইয়া কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান।"

কি উদার মত! কোন্ কর্ম্ম সৎ, কোন্ কর্ম্ম অসৎ, এ প্রশ্ন সততই মনে উঠিতে পারে। এ সম্বন্ধে গীতায় উক্ত আছে—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ।

অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কর্ম্ম সকল আমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকার শূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে। 'কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে, অর্থাৎ কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবে। ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে; অতএব কর্ম্মযোগই ভক্তিযোগ।"

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, ভক্তি যোগ সাধন করিতে হইলে কর্ম্মযোগ পরিহার করিতে হয়, গীতাতে এ ভ্রমের নিরসন হইয়াছে। কর্ম্ম ভিন্ন যে ভক্তি—সে অলস লোকের কল্পনা-মিশ্রিত ভাব মাত্র।

ভক্তির দ্বিতীয় সোপান জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন আপন ও ঈশ্বরের তত্ত্বে মানুষের বোধ জন্মে না। আমাকে জানা ও ঈশ্বরকে জানা—ভক্তি সাধনের জন্য, এ দুইই প্রয়োজন। জানিতে হইবে—আমি সসীম, ক্ষুদ্র, শক্তিহীন, পাপী, নরাধম,—আমি যাহা তাহাই, আর তিনি অসীম, মহান্, শক্তিশালী, পুণ্যময়, জগদীশ্বর। এই জ্ঞান জন্মিলে তবে তাঁহাকে ও তাঁহার প্রিয় জগৎকে ভক্তি করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মিবে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন, "জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি

হওয়া চাই। * * পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না হইলেও সে জ্ঞানী।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ
বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ। ৪।১০

অর্থাৎ যাহারা চিত্তসংযত ও ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পূত হইয়া তাঁহাকে পায়। আসল কথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্মের এমন মর্ম নহে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই। কেবল কর্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানেও নহে। কর্মেই আবার জ্ঞানের সাধন। কর্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়।"

ভক্তির প্রথম সোপান কর্ম, দ্বিতীয় সোপান জ্ঞান। এই দুইয়ের সংযোগ চাই। এ সম্বন্ধে গীতাতে উক্ত হইয়াছে,—

"যোগ সংন্যস্ত কর্মাণং জ্ঞানসংছিন্ন সংশয়ং
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। ৪।১৮ ৪১

হে ধনঞ্জয়। কর্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংন্যস্তকর্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবানকে কর্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না।"

"তবেই চাই, (১) কর্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এই রূপে কর্মবাদের ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল।"

সন্ন্যাস ধর্ম তবে কি অবহেলার জিনিস? যাঁহারা উপরোক্ত কথাগুলি ভালরূপ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, "নিষ্কাম কর্মই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে আর বেশী কিছুই নাই। বেশীর মধ্যে আছে, নিষ্প্রয়োজনীয় দুঃখ। গীতায় উক্ত হইয়াছে—"যাঁহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহাকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। * * কর্মহীন সন্ন্যাস, নিকৃষ্ট সন্ন্যাস। কর্ম, বুঝাইয়াছি ভক্ত্যাত্মক। অতএব গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত্যাত্মক কর্মযুক্ত সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস।"

অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, অরণ্যে না গেলে প্রকৃত ভক্তি সাধন হয় না। ব্রাহ্মসমাজ একাল পর্য্যন্ত উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকৃত বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস, আত্মার একটা

অবস্থা মাত্র, বাহিরের গৈরিক ভেকে বা শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় না। ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব না বুঝিয়া বহুলোক বৃথা হুজুগ ধরিয়া মরে।

বঙ্কিম বাবু, ভক্তির বিশদ ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, পূজা, হোম, যজ্ঞ, নামসংকীর্ত্তন সন্ধ্যা বন্দনাদি সম্বন্ধে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন—"তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বর চিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্য-ভক্তির লক্ষণ। আর "আমার পাপ স্খলিত হউক, আমার সুখে দিন যাউক," ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যা বন্দনা, স্তুতি বা Prayer, গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। বঙ্কিম বাবুর এই বিস্তৃত ও বিশদ ধর্ম্ম ব্যাখ্যার মধ্যে প্রার্থনাদি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, এই স্থলে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত তাঁহার মতের গভীর পার্থক্য রহিয়াছে। স্বাভাবিক প্রার্থনা, ধর্ম্মজগতের একটা দুর্জ্জয় শক্তি বিশেষ। ক্ষুদ্র সসীম ব্যক্তি, অনন্তগতি হইয়া, যখন অসীম অনন্ত শক্তির নিকট কাতরে কৃপা প্রার্থনা করে, তখন তাহাকে কেহই উড়াইয়া দিতে পারেন না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে দেখিয়াছি—সরল প্রার্থনাই ধর্ম্ম জীবনের—ভক্ত জীবনের এক মাত্র বন্ধু, যাহার বলে মানুষ জগতে অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ। ইহাকেই জগতের লোকেরা Miracle বলিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুও প্রকারান্তরে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন—তিনি বলেন, "অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত, ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে যে, অস্ত্র নিষ্ফল হয়।" এই যে ঈশ্বর-কৃপা লাভ, ইহা ঐকান্তিকী প্রার্থনার অবশ্যম্ভাবী ফল। সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা, ধর্ম্মের উচ্চসোপানে—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—অথবা "Thy will be done," ইহার মধ্যে সমস্ত ভক্তিতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সমস্ত বৃত্তি অনুশীলিত হইয়া যখন সিদ্ধির অবস্থায় মানুষ উপস্থিত—যখন তিনি ও ভক্ত একত্রে, তখনও এরূপ প্রার্থনা স্বাভাবিক। কেননা, তিনি যে প্রভু, আমি যে দাস, তিনি যে মহান্, আমি যে ক্ষুদ্র। ভিক্ষা না করিলে আমার দিন যাইবে কেন?—না চাহিলেও তিনি দিবেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমার চাহিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি

লোপ হইবে কেন ? আমি চাহিব, ইহা আমার প্রাণের বিশেষ ভাব; তিনি দেন, ভালই; না দিলেও চাহিব। কেননা, না চাহিয়া ত পারি না। আমার অভাব যে অনন্ত—তাহা পূরণের আর ত কোন উপায় দেখি না। আমার একমাত্র উপায় যে তিনি। করযোড়ে, প্রাণ মনের সহিত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট বলিতেন—"দ্বারে আঘাত কর, দ্বার মুক্ত হইবে,—চাও, পাইবে।" প্রার্থনাকে গৌণ ভক্তি বলায় বঙ্কিম বাবুর আধ্যাত্মিকতার কিছু স্থূলদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্ম্ম জগতে এমন ভক্তের কথা আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই, যিনি প্রার্থনা-পরায়ণ ছিলেন না। বিষ্ণুপুরাণ হইতে বঙ্কিম বাবু প্রহ্লাদ চরিত্রে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রহ্লাদের কামনা নিষ্কাম ছিল। আমরাও প্রতিপন্ন করিতে পারি—মানুষের "প্রার্থনা"ও নিষ্কাম হইতে পারে। কেবল তাঁহাকে পাইবার জন্ত যখন কাতর প্রার্থনা করে, অর্থাৎ যখন মানুষের অন্ত কামনা রহিত হয়, তিনিই লক্ষ্য হন, তখনই প্রার্থনা নিষ্কাম। আমি যা চাই, সে সকলেরই লক্ষ্য ঈশ্বর হইতে পারেন। সুতরাং মানুষের সকল প্রার্থনাকেই নিষ্কাম বলিব, তাহাতে আর বাধা কি ? সকল কামনা যখন তাঁহাতে সংস্থস্ত, তখনই ত প্রকৃত ভক্তির উদয়। আমরা অতি ক্ষুব্ধচিত্তে বলিতে বাধ্য হইতেছি—বঙ্কিম বাবু প্রার্থনা রূপ ধর্ম্মের সরল, মধুর রাজ্যে এখনও বুঝিবা পৌঁছিতে পারেন নাই। তবে এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত নহি যে, ব্রাহ্মসমাজে যে মুখস্থ মন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনা "অন্ধকার হইতে আলোতে ইত্যাদি' করা হয়, তাহা সারধর্ম্ম বা ভক্তির অনুমোদিত না হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে এ প্রদেশে এক দল ভুঁইফোড় হিন্দুধর্ম্মবিৎ দিগ্‌গজ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা উপন্যাসকে উপন্যাস বলিতে, কাব্যকে কাব্য বলিতে কুণ্ঠিত। মহাভারত, রামায়ণে যে ইতিহাসের ছায়া অতি অল্প, এ কথা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি, সম্প্রতি এই কথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করায়, অদ্বিতীয় দেশহিতৈষী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা রমেশচন্দ্র ছেলে মহলে অনাদৃত হইয়াছেন,—অর্থাৎ টেক্ট-বুক-কমিটীর ধুরন্ধরগণের যোগে, বঙ্গবাসী-প্রমুখ হিন্দুর দল, আপন আপন ইতিহাস কাটতির হ্রাস হেতু, একটা বিরাট আন্দোলন তুলিয়া রমেশ বাবুর ভারতবর্ষের ইতিহাস খান স্কুল হইতে তুলিয়া দিতে সমর্থ হইয়া দেশে কীর্ত্তিস্তম্ভ

প্রোথিত করিয়াছেন*! প্রকৃত ইতিহাস-শূন্য এই হতভাগ্য দেশে কেবল দুই খানি ইতিহাসের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল—৺রাজকৃষ্ণের বাঙ্গলার ইতিহাস ও রমেশচন্দ্রের ভারতবর্ষের ইতিহাস। কিন্তু হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী। এ দেশে তাহা আদৃত হইবে কেন? খোসামুদী, ঘুষ, ও ভালবাসার মায়ার কুহকে যে দেশের পুস্তক নির্ব্বাচক-সম্প্রদায় বশীভূত, সে দেশে এরূপ হইবে, বিচিত্র কি? বঙ্কিমচন্দ্র সাহসী পুরুষ—জ্ঞানী, প্রতিভাশালী। প্রতিভার নিত্য সহায় সাহস। কাপুরুষ প্রতিভাশালী লোক, কাঁটালের আমসত্ত্ববৎ। সাহসী পুরুষ ভিন্ন কেহই জগতের কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে সাহসী প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি বলিয়াছেন, শুন,—

"শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে।" ধর্ম্মতত্ত্ব—১৮৬ পৃষ্ঠা।

"ভবগদ্গীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত।" ২০৫ পৃষ্ঠা।

বিষ্ণুপুরাণে যেরূপে প্রহ্লাদের কথা কথিত হইয়াছে, ঠিক সেই রূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিয়াই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি।" ২১০ পৃষ্ঠা।

"প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস, তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্যাসে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়।" ২১১ পৃষ্ঠা।

"তারপর হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্যাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা করি, তুমি বিরক্ত হইবে না।" ২১২ পৃষ্ঠা।

শাস্ত্রের মর্ম্ম, ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব না বুঝিয়া বর্ত্তমান সময়ের লোক সকল সর্ব্বকর্ম্মী, সর্ব্বধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর এই উপদেশ তাঁহাদের, আস্ফালনটা একটু কমিলে আমরা যারপর নাই সন্তুষ্ট হইব। দেখ,

* ১২৯৭ কার্ত্তিক মাসে লিখিত।

বিশুদ্ধ ভাষায়, তেজের সহিত, তারপর উদার ধর্ম্ম-পিপাসু বঙ্কিমচন্দ্র কি বলিতেছেন।

"খ্রীষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত। গড্ বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপাল জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও, তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধম ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুয়ানি যায়।" ২২৩ ও ২২ পৃষ্ঠা।

আমরা ব্যক্ত করিয়াছি যে, বঙ্কিম বাবু ভক্তির যেরূপ বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এরূপ আর শুনি নাই। কেহ কেহ এ কথাতে বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা জানি। তাঁহাদিগকে অধিক আর কি বলিব, তাঁহাদিগকে একবার অনুরোধ করি, এই গ্রন্থ খানি একবার পড়িয়া দেখুন। এমন উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর বঙ্কিম বাবু ভক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তাহা অতি আশ্চর্য্য,—"যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।" এই ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাতেই গ্রন্থ খানির আরম্ভ, ইহাতেই শেষ। এ স্থলে এ কথা না বলিলেও ত্রুটী থাকিয়া যায় যে, বিষ্ণুপুরাণ হইতে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ভক্তির যে তারতম্য তিনি ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, তাহা অতি উদার ও অতি সুন্দর হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে তাঁহার কথাটী কেবল তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

"যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম যে উপাসনা সেই কাম্য কর্ম্ম; নিষ্কাম যে উপাসনা সেই ভক্তি। ধ্রুবের উপাসনা সকাম,—তিনি উচ্চপদ লাভের জন্যই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে; ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবৃত্তি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম। তিনি

কিছুই পাইবার জন্ত ঈশ্বরে ভক্তিমান হয়েন নাই, বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান হওয়াতে বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও, তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই।" ২০১ পৃষ্ঠা।

ভক্তের লক্ষণ কি কি? এ সম্বন্ধে পৃথিবীতে অনেক মত ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর মতগুলি সংক্ষেপে এখানে তুলিয়া দেখাইব, ব্যাখ্যা কত দূর সমীচীন হইয়াছে।

"ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, তাহার আবার অবরোধ কোথায়। ভক্তি শাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।" ১৪৩ পৃষ্ঠা।

"স্থূল কথা এই, যে যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্ম্ম সম্বন্ধেই সন্ন্যাসী, তিনিই ধার্ম্মিক।" ১৮৫ পৃষ্ঠা।

"তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক ও ঈশ্বরভক্ত, উভয়েই ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মোপাসকেরা অধিকতর দুঃখ ভোগ করে, ভক্তেরা সহজে উদ্ধৃত হয়।" ১৯৭ পৃষ্ঠা।

"যে মমতাশূন্য, অহঙ্কার শূন্য, যাহার সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাত্মা, দৃঢ় সঙ্কল্প, যে হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত, যে বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, যিনি দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষার অতীত, যাঁহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোষ্ণ, সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আসঙ্গ-বিবর্জ্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, সেই ভক্তই আমার প্রিয়।" গীতা ১২।১৩—২০।

"ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্ ঠক্ করিয়া হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা

শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে।" ২০০ পৃষ্ঠা।

তৎপরে ভক্তির সাধন সম্বন্ধে গীতার উপদেশ ব্যাখ্যাত করিয়া তিনি বলিতেছেন—"প্রথম সাধন, চিত্ত ভগবানের স্থির রাখা। (২) স্থির রাখিতে না পারিলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য্য অভ্যস্ত করিবে। যাহারা কর্ম্ম করিতে পারে, তাহারা ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম করিয়া মন স্থির করিবে। (৩) তাহাতে অসমর্থ হইলে ভগবানাশ্রিত হইয়া কর্ম্ম করিবে। (৪) তাহাতে অশক্ত হইলে যতাত্মা হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগ করিবে। এই চতুর্ব্বিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ইহা যাহারা না পারিবে, তাহারা উপাসনাদি কবিবে।" "তবে কি গীতায় সাকার মূর্ত্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে?"—শিষ্যের এ কথার উত্তরে গুরু বলিতেছেন—"ফল পুষ্পাদি প্রদান কবিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, সেই খানে তিনি পাইবেন।"

প্রতিমাদির পূজা সম্বন্ধে বলিযাছেন, অধিকার ভেদে নিষিদ্ধ এবং বিহিত। ভাগবতপুরাণ হইতে যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি, সর্ব্বভূতে ভূতাত্মা স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা কবিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমা পূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আত্মাস্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।" ৩স্ক। ২৯অ। ১৭।১৮।—২৩৪ পৃষ্ঠা।

"যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মে রত, সে যতদিন না আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পূজা করিবে।" গীতা, ২৯অ। ২০।—২৩৪ পৃষ্ঠা।

তার পর বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন—

"যাঁহার সর্ব্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদির অর্চনা বিড়ম্বনা। আর যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদির পূজা নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে যতদিন সে জ্ঞান না জন্মে, ততদিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহিত নহে, কেন না, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমা পূজা গৌণ ভক্তির মধ্যে।" ২৩৪ ও ২৩৫ পৃষ্ঠা।

"ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাঁর কাজ। অতএব, যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ম্মই কৃষ্ণোক্ত "সৎকর্ম্ম," তাহার সাধনে তৎপর হও এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক অনুশীলনের দ্বারায় যে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও। তাহা হইলে যাঁহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম্ম, তাঁহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত হইবে।" * * * যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা, নামকীর্ত্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ব্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্ব্ব প্রকার সাধনের অভাবই ভাল।" ২৩৬ ও ২৩৭ পৃষ্ঠা।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বঙ্কিম বাবু যখন প্রতিমা পূজাকে গৌণ ভক্তির' সাধনের উপায় মধ্যে ধরিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রতিমা পূজাকে একেবারে তুলিয়া দিয়াছেন, তখন উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় কই? এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাই না। কেবল এই বলি—প্রতিমা পূজার অর্থ, কল্পনার পূজা। ব্রাহ্মধর্ম্ম যতই মহান্ ও উন্নত হউক না কেন, এই কল্পনার হস্ত হইতে যে একেবারে নির্ম্মুক্ত, তাহা আমরা মনে করি না। জড় দেহধারী মানুষের পক্ষে কল্পনার অতীত হইতে পারা বড়ই কঠিন। যে, যে পরিমাণে জড়ের অতীত হইয়া চিন্ময় রাজ্যে বাস করে, সে সেই পরিমাণে কল্পনার অতীত হয়, অর্থাৎ সে সেই পরিমাণে চিন্ময়ের উপাসক বা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যার যে প্রণালী দেখা যায়, তাহা এই কল্পনারই ক্রীড়া মাত্র। স্বরূপতঃ ভগবানের সহিত যাহার সাক্ষাৎ হয়, সে আর তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এই জন্যই মহাজনেরা বলিয়াছেন যে, তিনি বাক্য ও মনের অতীত। বাক্যের অতীত যিনি, তাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যা যে প্রতিমা পূজার ন্যায় নিকৃষ্ট সাধনা, ইহাতে সংশয় কি? এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিয়া সকলের বিরাগভাজন হইতে চাহি না; তবে, বঙ্কিম বাবুর প্রতিমা পূজার ন্যায় নিকৃষ্ট পূজার হস্ত হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সুরক্ষিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্কিম বাবু যে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আর বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। তিনি সবল ভাষায় বলিতেছেন—

"সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে, সকল সময়ে, সোজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, দুই এক জন বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহিত। এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে; * * * অতএব সর্ব্ব প্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি করুণাময়—যাহাতে সকলের পক্ষে ধর্ম্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।" ১৯৫ ও ১৯৬ পৃষ্ঠা।

---

(৪)

উপসংহার।

বঙ্কিম বাবুর সার সার মতগুলি আমরা সংক্ষেপে দেখাইয়াছি। দুই স্থানে সামান্য একটু অমিল হইয়াছে;—প্রথম যুদ্ধার্থে সুরাপান এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং দ্বিতীয় প্রার্থনাকে ভক্তির নিকৃষ্ট অঙ্গ রূপে প্রতিপাদন। শেষোক্ত স্থলে বরং আমরা উদার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি—ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে প্রার্থনার প্রয়োজন না থাকিতেও পারে,—তখন "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" ইহাই সকল প্রার্থনার সার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু প্রথম স্থলে আমরা কিছু দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, এই সামান্য মতভেদে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছি, প্রকারান্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মই তিনি প্রচার করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন চিন্তা-যুক্ত কথা বলিতে হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমর্থন করিতে হইবে। বঙ্কিম বাবুর মত সমালোচন করিয়াছি বলিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমাদের এক মাত্র অনুরোধ এই, বঙ্কিম বাবুর পুস্তক খানি সমস্ত পাঠ করেন। তবে এ কথাও বিনীত ভাবে স্বীকার করিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা যেরূপ অর্থে বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি। এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়া থাকি, সংবাদ পত্রের দ্বার অবারিত, সকলই আমাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে পারেন।

আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বোধ হয়, একটী গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। আমরা এই সমালোচনা করিতে অধিকারী কি না, জানি না। প্রাণের আবেগে,—অনেক যাহা-ইচ্ছা-তাই মত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি। তাহাতে কেহ প্রাণে আঘাত পাইয়া থাকিলে, আমাদিগকে ক্ষমা করেন, বিনীত অনুরোধ। তবে যাঁহারা, আমরা বঙ্কিম বাবুর অন্যায় প্রশংসা ঘোষণা করিয়াছি বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই একটী কথা কেবল বলিতে চাই—আমরা তাঁহার প্রশংসা করিয়া ধন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও এ সম্বন্ধে আমরা কৃপণ। যে দিন প্রশস্ত হৃদয়ে প্রকৃত মহৎ ও গুণী ব্যক্তির প্রশংসা করিতে শিখিব, সে দিন আমরা এই পূতিগন্ধময়, হিংসাবিদ্বেষ পরিপূর্ণ সংসারের একটু উপরে উঠিতে পারিব। সে অবস্থা এখনও হয় নাই, তাই আমরা দুঃখিত। বঙ্কিম বাবু ধর্ম্মতত্ত্বের কেবল প্রথম ভাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এখনও উত্তর ভাগ অবশিষ্ট আছে। আমরা তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। আজ কাল যদিও না হয়, আমাদের বেশ বিশ্বাস আছে, এক দিন না একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের এই "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রতি গৃহে অধীত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের আর আর সমস্ত পুস্তকের সহিত ইহাও স্বর্ণাসন প্রাপ্ত হইবে।

সান্ত্বনা।

মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, এ কথাটির নানা শাস্ত্রে নানা উত্তর পাওয়া যায়। সকল শাস্ত্র এক স্থানে ঐক্যমত যে, মৃত্যুতেই মানুষের শেষ হয় না, মৃত্যুর পরও মানুষ থাকে। চির উন্নতিশীল আত্মা, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার উত্তেজনায় যে সদা বিজড়িত, মৃত্যুই তাহার শেষ পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। "এই আত্মা-দীপটী জ্বলিতেছিল,—এই একেবারে চিরতরে নিবিয়া গেল," এ বিশ্বাস মানুষের প্রাণে স্থান পায় না। সকল শাস্ত্র একবাক্যে বলে, আত্মা থাকিবে। এই বিশ্বাসেই মানুষ সংসার পাতে, পাপকে ভয় করে, পুণ্যকে আদর করে। মরিয়াই জীবনকে শেষ করা যায়, এ বিশ্বাস থাকিলে ধর্ম্মকর্ম্ম সকল লোপ পাইত। অবহমান কাল এই যে দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের মনে বিদ্যমান, মানুষ মৃত্যুর পরেও থাকিবে, এই বিশ্বাসই উজ্জ্বল প্রমাণ যে, আত্মা অমর। এ বিশ্বাস কোথা হইতে উদ্ভূত?—এক অবিনাশী, মূল শক্তিকারণ হইতে, ইহা

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মানুষ যে মৃত্যুর পরেও থাকিবে, সকল মানবমণ্ডলীর বিশ্বাসের একতাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল যুক্তি আছে, এই প্রমাণের নিকট সে সব তুচ্ছ। মানিলাম, মৃত্যুর পরেও মানুষ থাকিবে, কিন্তু কোথায় থাকিবে? আকাশে, শূন্যে, নক্ষত্র লোকে, না এই পৃথিবীতে? এ প্রশ্নের উত্তর নানা শাস্ত্র নানা-রূপে দিয়াছে। কেহ বলে, মানুষ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে, নানা যোনি ভ্রমণ করে, মরিয়া কেহ বা ভূত হয়, কেহ বা দেবতা হয়, কেহ বা স্বর্গে যায়, কেহ বলে, গ্রহান্তরে বাস করে; কেহ বলে, আবার ফিরিয়া এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, ইত্যাদি। এ স্থলে বিশ্বাসের সমতা নাই। সুতরাং এ বিষয়ে কেবল যুক্তিতর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া কঠিন। আমাদের বিশ্বাস, সহজাত বা সাম্প্রাণিত বিশ্বাস ভিন্ন কেবল যুক্তিতর্কে ধর্ম্মজগতের কোন তত্ত্বেরই স্থির মীমাংসা হয় না। এ বিষয়ে সকল জাতির সহজাত বিশ্বাসের ঐক্য নাই, সুতরাং স্থির মীমাংসা করা কঠিন। এ বিষয়ে একটু আলোচনায় আমাদের ধারণাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই।

আমরা প্রকৃতির মূলে একটী জীবন্ত সত্য দেখিতে পাই—সৃষ্ট সকল জিনিসই অবিনশ্বর। উন্নতির ষোলকলা পূর্ণ হইলে, অথবা যে যে ভাব দেখাইতে সৃষ্ট, সেই ভাব দেখান হইলেই পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু পরিবর্ত্তনে বস্তু অবস্থা হইবে অবস্থান্তরে যায়, ধ্বংস হয় না। বিজ্ঞান বলেন, কোন সৃষ্ট বস্তুই ধ্বংস হয় না। মানুষের দেহ, মৃত্যুর পর শ্মশানে ভস্ম হইল। ইহার অর্থ এই, মানুষের দেহ পঞ্চভূতে মিশিল,—দেহ পবিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু দেহের অবশেষ রহিল। এই পঞ্চভূতের সাহায্যে আবার কত কত সৃষ্টির প্রক্রিয়া সাধিত হইতেছে। পশুর হাড় মৃত্তিকার উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করি-তেছে, মৃত্তিকার উৎপন্ন শাক সবজি খাইয়া পশু পক্ষী ও মনুষ্য দেহ ধারণ করি-তেছে। মানুষের দেহের পরিণাম যে পঞ্চভূত, তাহাও এই রূপে কোন না কোন জগতের কাজ সাধন করিতেছে। জল, বায়ু, মৃত্তিকা ভিন্ন কোন বস্তুই জন্মে না। দেহাবশেষ, জল, বায়ু, ও মৃত্তিকায়ই বিমিশ্রিত। সুতরাং, মানব দেহাবশেষ যে জল বায়ু মৃত্তিকা, তাহাতেও সৃষ্টির কাজ হইতেছে। পরিবর্ত্তন-চক্র ঘুরিতেছে, অবস্থার পর অবস্থা, অবস্থার পর অবস্থা—সৃষ্টিতে কেবল এই রূপই ঘটিতেছে। ধ্বংস কিছুই হইতেছে না। জড়ের পরিবর্ত্তনে জীব, জীবদেহের পরিবর্ত্তনে জড়, আবার জড় হইতে

জীব—এইরূপ সদা অবিরাম পরিবর্ত্তন-চক্র ঘুরিতেছে। মৃত্যুকে যে ধ্বংসের কারণ বলে, সে প্রকৃতি-তত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্ব কিছুই বুঝে না। জীবাহারে জীবদেহ ধারণ অন্যায় বলিয়া যাঁহারা অভিমত জ্ঞাপন করেন, যুক্তিতে দেখি, তাঁহারা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ঘোরতর অবিশ্বাসী। মাতার শরীর সন্তানের জন্ত বিলয় পাইতেছে, অথবা এক পশু অন্ত পশুর মাংসে জীবন ধারণ করিতেছে, ইহাতে তাঁহারা কাতর হন না কেন, জানি না। একের জন্ত অপরের দেহ ধারণ, অথবা এক অবস্থা আর এক অবস্থার কারণ, অথবা এক জিনিসের পরিণতিতে আর এক জিনিস—অথবা এক মূল শক্তিরই বিকাশ এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি, এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলে আর পরিবর্ত্তন দর্শনে মন ভাঙ্গে না, মানুষকে মানুষ ঘৃণা করিতে পারে না; ধর্ম্ম, আহারে বা পানভোজনে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এ বিশ্বাস থাকে না। ধর্ম্ম, অন্তরের জিনিস, বাহিরের নয়। বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলই মনে। মূল বিশ্ব-শক্তিতে যে না পৌঁছিতে পারিয়াছে, সে বৃথা হই-চই করিয়া মরিতেছে।

এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্ব প্রকৃতি অবিনাশী এক বিশ্বমূলশক্তির আভাস। সেই শক্তিই পাহাড় পর্ব্বতে, সাগরে ও জীব জন্তু উদ্ভিদে। যাহা কিছু আছে, সেই শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই আছে। সেই শক্তির অবিনাশিত্ব হইতেই এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা পৃথিবী অবিনাশিত্ব পাইয়াছে। পরিবর্ত্তন নিয়তই দেখিতেছি, কিন্তু কিছুই বিনষ্ট হইতেছে না। মহেশ্বরের এ এক অপূর্ব্ব লীলাতত্ত্ব।

মহাত্মা ডারবিন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বন্য পশুর ব্যাবৃত্তিতে বা বিকাশে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মানবের ব্যাবৃত্তি ও বিকাশে কিসের উন্নতি হইতেছে, কে জানে? মানুষ আসিতেছে, মানুষ যাইতেছে, কত সহস্র যুগে কত মানুষ এই ধরাবক্ষকে কত ভস্ম-স্তূপে পরিপূর্ণ করিয়াছে, কে জানে? সেই মানব-ভস্ম-স্তূপ হইতে এ জগতের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিকাশ পাইতেছে!! আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব অনুধাবনে যত প্রবৃত্ত হই, ততই বিস্ময়ে নিমগ্ন হইয়া যাই।

জড়দেহ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম, আত্মিক জগতে একথা কি খাটে না? কেন যে খাটিবে না, এ সম্বন্ধে কে উজ্জ্বল প্রমাণ দেখাইতে পারেন? আমাদের বিশ্বাস, জড়দেহ দ্বারা যেমন জগতের সৃষ্টি হইতেছে, আত্মার দ্বারাও তেমনিই জগতের সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে। যে জন্মিয়াছে, সে অবি-

নশ্বর,—অবস্থার নানা পাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে একবার যাইতেছে; কিন্তু আবার সে যে ফিরিয়া আসিয়া ঘুরিতেছে না, কেমনে বুঝিব? তুমি বলিবে, যদি তাই হবে, তবে পূর্ব্ব জন্মের সংবাদ সে রাখে না কেন? এ কথার উত্তরে আমি বলি, তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে, একথা ত ঠিক, তুমি বাল্য অতিক্রম করিয়াই এত বড় হইয়াছ, এ কথাও ত ঠিক, বল ত তুমি মাতৃগর্ভের কথা বা বাল্যকালের কথা বলিতে বা স্মরণ করিতে পার না কেন? তুমি বলিবে, মাতৃগর্ভ বা বাল্যাবস্থার কথা তুমি বলিতে পার না, কেন না, সে সময় তোমার মস্তিষ্ক পরিস্ফুট হয় নাই। ঠিক এই যুক্তি ধরিয়া আমি বলি, তোমার পূর্ব্ব জন্মের বা পূর্ব্বাবস্থার মস্তিষ্ক নাই বলিয়া তুমি সে সময়ের কথা স্মরণ করিতে পার না। স্মৃতি, জড়দেহের গুণ। স্মৃতি থাকুক, আর না থাকুক, তাহাতে মানুষের কিছু আসিয়া যায় না, মানুষের উপার্জ্জিত বা সঞ্চিত প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান পুণ্যের হ্রাস হয় না। কঠিন পীড়ার সময় বা উন্মাদ অবস্থার সময় লোকের স্মৃতি-শক্তি বা মস্তিষ্ক-শক্তি লোপ পায় বলিয়া তাহার প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান পুণ্যের ফল বা মনুষ্যত্ব লোপ পাইল, কেহই এরূপ মনে করেন না। আত্মিক জগতে প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান কর্ম্মের যে যোগ, সেই যোগই অবিনশ্বর, স্মৃতি থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে এ সকল লোপ পায় না। আবার দেখ, কেহ শৈশবেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লইয়া উপস্থিত, কেহ বাল্যেই মহা প্রতিভাশালী। মিল সাহেব অল্প বয়সে কত পাণ্ডিত্যের বিকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যে পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত মনুষ্যত্ব নাই, কে বলিতে পারে? মানুষ যে প্রথম জন্মেই বড় হয়, একথাই কে বলিল? বানরটা এক জন্মেই যে ধা করিয়া মানুষ হইয়া গেল, ডারবিনও তাহা বলেন না। কত জন্মের পরিণতি, ব্যাবৃতি বা বিকাশে যে আজ এই সমুন্নত বা সমুজ্জ্বল মানব জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, আত্মিক জগতের ডারবিন যখন আসিবেন, তখন তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। জীব-দেহ-জগতে, বহু জন্মের পর বানর মনুষ্য হইয়াছে, আত্মিক জগতে মনুষ্য দিন দিন দেবত্বে চলিয়াছে। অতীত কালের প্রেম ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মের ফলে আজ পৃথিবী কত সমুন্নত হইয়াছে। আত্মিক জগতের উন্নতির ফলভোগী এই জগত যদি না হইত, এই পৃথিবীর ধারাবাহিক এত উন্নতি হইত কি না, কে বলিতে পারে? আমাদের বিশ্বাস, যে অপূর্ণ অবস্থায় যাইতেছে, সে আবার রূপান্তরিত অবস্থায় আসিতেছে। পশু জন্ম হইতে মানব জন্ম, মানব জন্ম হইতে আরো উন্নত মানব জন্ম, উন্নত মানব জন্ম হইতে দেবভাব

জন্ম, এইরূপ হইতেছে। আমাদের এ সিদ্ধান্ত অমূলক বলিয়া কেহ কি প্রতিপন্ন করিতে পারেন? আর একটী কথা—এই পৃথিবী মানবের শিক্ষালয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষ শিক্ষা করিতেছে, জ্ঞান পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছে। মানব জন্মের একটী অবিসম্বাদিত উদ্দেশ্য আছে, সকলেই স্বীকার করেন। আমি ও তুমি, বিধাতার কোন একটী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আসিয়াছি। আমাদের জীবনের কি উদ্দেশ্য, তাহা হয় ত আমরা জানি না, কিন্তু একটী উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও আমাদের সৃষ্টি হইত না। যাহাকে নরকের কীট বলিয়া ভাবিতেছ, তাহারও জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে এবং সে যতই স্বাধীনতার বলে বিপথে গমন করুক না, আমাদের বিশ্বাস, বিধাতার উদ্দেশ্য তাহার জীবনেও তিনি সম্পূরণ করিয়া লইবেনই লইবেন। চণ্ডাল ও মুচির ভিতরেও অবিরত তাঁহারই মহান্ ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইতেছে। মানুষ তাঁহার যে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে, দেখিতেছি, জলবায়ু বা পিতামাতার দোষে সকলে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিতেছে না। দেহ ধারণ করিয়া কেহ এক দিন, কেহ এক বৎসর,কেহ বা দশ বৎসর পরেই জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। শরীর এমনই অপটু যে, কিছুতেই তাহার থাকা হইল না। বিধাতার উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা সেই অল্প মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ হইল, ভাবিলে, আর গোল থাকে না, কিন্তু তাহা সব সময়ে ভাবিতে পারা যায় না। অপূর্ণ পিপাসা, অপূর্ণ শরীর—সমস্ত অপূর্ণ থাকিতেই তাহাকে অন্তর্দ্ধান করিতে হইল। কেহ মহামারিতে মরিল, কেহ অস্ত্রের দ্বারা আহত হইয়া মরিল। যে হঠাৎ মরিল, অর্থাৎ জীবদেহের পরিণতির পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিল, সে আবার না ফিরিয়া আসিলে জীবলীলায় বিধাতার ইচ্ছা-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ হয় কই? এই জন্য আমাদের মনে হয়, অসম্পূর্ণ অবস্থায় যে. যায়, সে আবার রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া আইসে ও আসিতে পারে। আসিয়া আবার যায়, আবার আইসে। জীবলীলার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দেহাবসানে যখন যায়, তখন আর আইসে না। দেহাবশিষ্ট বস্তু হইতে যেমন পৃথিবীর সৃষ্টির প্রক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে, কোন কোন আত্মার দ্বারাও সেইরূপ হইতেছে না, কেমনে ভাবিব, বলত? অথবা আকাশে, স্বর্গে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মানুষ মৃত্যুর পর ভ্রমণ করে, ইহা যেরূপ যুক্তিসিদ্ধ, এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা কি ততোধিক যুক্তিসঙ্গত নয়? "স্মৃতির" যুক্তিতে হাতে পানি মিলে না বলিয়া বিধাতার মহা লীলা-মাহাত্ম্য উড়াইয়া দেওয়া উচিত নয়।

আর একটী কথা, দেখ, যে যায়, সে আবহমান কালই জগতের কোন না কোন আত্মার উপর রাজত্ব করিতেছে। খ্রীষ্ট প্রায় দুই সহস্র বৎসর গিয়াছেন, কিন্তু আজও তিনি এ জগতে কার্য্য করিতেছেন। কল্পনায় নয়, সত্য সত্যই তিনি আজও জগতে বীরের ন্যায় কাজ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে উক্ত আছে—"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌররায়, কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।" একথা চৈতন্যের দেহ সম্বন্ধে কি আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, পাঠকগণ বিচার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, দেহ আত্মা উভয়েই তিনি এ জগতে থাকিতে পারেন। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বৃন্দাবনে চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন, শুনিয়াছি। এ ঘটনার সত্য মিথ্যা, পাঠকগণ বিচার করুন। খ্রীষ্টের জলন্ত বিশ্বাস, শ্রীচৈতন্যের প্রেম, মহম্মদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, বুদ্ধের নির্ব্বাণ আজও আত্মিক জগতে কার্য্য করিতেছে, আরো কত বৎসর ধরিয়া এইরূপ কার্য্য করিবেন, কে জানে? তাঁহাদের দেহের অবশিষ্ট আমাদের মধ্যে থাকা যেমন সম্ভব, আত্মার অবশিষ্ট থাকাও তেমনি সম্ভব। শক্তি এক ভিন্ন দুই কি বহু নাই। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যেমন এই সান্ত খণ্ড খণ্ড জগতের উৎপত্তিতে, সেইরূপ অখণ্ড পরমাত্মার গুণাবশেষ খণ্ডাকারে লইয়া মানবের সৃষ্টি। এই মানবাত্মার খণ্ড খণ্ড লইয়া বহু আত্মার যে সৃষ্টি হইতেছে না, কে জানে? জীব সংখ্যা বৃদ্ধিই যে ইহার একটী কারণ নয়, তাহাই বা কে নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করিতে পারে? বিধাতা মহাশক্তিশালী, আকাশে নক্ষত্র লোকে মৃত্যুর পর আত্মাকে পাঠান তাঁহার আয়ত্বাধীন হইলে, এখানে আবার পাঠানই বা কেন তাঁহার আয়ত্বাধীন হইবে না, বুঝি না। প্রাচীন আর্য্য জাতির মহাত্মাসকল এখন যে নবোত্থিত ইংলণ্ড, জর্ম্মনি ও আমেরিকার মহোন্নত জাতি সকলকে অলঙ্কৃত করিতেছেন না, কে বলিতে পারে? বিশ্বাসীদিগকে কৃতার্থ করিতে খ্রীষ্টের প্রেতাত্মা যে পৃথিবীতে আবার অভ্যুদিত হন নাই, আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। গৌরচন্দ্র যে ভক্তদেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন না, তাহাই বা কে জানে? বিশ্বাস এবং প্রেমভক্তি প্রচার করা, এই উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্ত ছিল। পৃথিবী যখন এখনও বিশ্বাস ও প্রেম ভক্তি-হীনতায় জর্জ্জরিত, তখন বিধাতার আদেশে ইহাঁদের পুনঃ দেহ ধারণ অযৌক্তিক কথা নয়।

যুক্তিতর্কের কথা ছাড়িয়া এখন বিশ্বাসের কথা বলি। ভক্তের দাস

ভগবান, আমি বলি, অভক্তের দাসও ভগবান। ভক্তই হউক, অভক্তই হউক, ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি দেখা দেন। একাগ্রতা সহকারে, তন্ময় হইয়া ডাকিলেই যশোদার গোপাল যশোদার কোলে আসেন। শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনে বসিয়া চিরদিনই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণে পান। অবিশ্বাসী ইহাতে কল্পনা-কুয়াসা দেখে, কিন্তু বিশ্বাসী ইহাতে জীবন্ত সত্য দেখিয়া বিমোহিত হন। আমরা অভক্ত, কিন্তু ডাকিয়া দেখিয়াছি, বিধাতা আমাদিগেরও মনোবাঞ্ছা কতবার পূর্ণ করিয়া তাঁহার জীবন্ত মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন।

অনেকের বিশ্বাস, আত্মিক জগতের প্রার্থনা বিধাতা যেরূপ পূর্ণ করেন, দেহ বা জড়জগতের প্রার্থনা তিনি সেরূপ পূর্ণ করেন না। আমরা জানি, অনেক লোকের মধ্যেই এ বিশ্বাস আছে। আমাদের ধারণা, ইহারা ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধরূপে ভাবেন বলিয়া এরূপ হয়। এরূপ ভাবিলে, ঈশ্বরকে যে খণ্ডাকারে দেখিতে হয়, তাঁহারা বুঝেন না। আমরা বলি, তিনি সব পারেন। তিনি কৃপা করিলে প্রেম পুণ্য দিতে পারেন, তিনি কৃপা করিলে সুখ ঐশ্বর্য্য দিতে পারেন। তাঁহার দয়া ও কৃপা ভিন্ন কেহ কিছু পায় না। তিনি মাটীকে সোণা করিয়া দরিদ্রকে চিরধনী করিয়া দিতে পারেন। যাহা দেন, তিনিই দেন। ক্ষুধায় আহার, পিপাসায় জল, তিনিই মুখে তুলিয়া দেন। আমার হাত আমার হাত নয়, তাঁহারই হাত; তাঁহার ইচ্ছায় এ হাত আহার অন্বেষণ করিবার পথ পায়, অথবা আহার পায়। তিনি মাটী-মুষ্টিকে স্বর্ণ-মুষ্টি করিয়া হাতে তুলিয়া দেন। রোগের ঔষধ তিনিই দেন, শোকের সান্ত্বনা তিনিই প্রদান করেন। তিনি জীবন্ত, তিনি জাগ্রত। এই প্রকৃতির মূলে সর্ব্বদা এক কর্ম্মশীল মহাযোগী দেদীপ্যমান। আমি অভক্ত কিন্তু আমি ডাকিলেও তিনি কাছে আসেন, কথা বলেন, হাসেন, কত কি করেন? মানুষ যদি তাঁহাকে না দেখিত, কখনও মানুষ কি থাকিতে পারিত? তাঁহার দেখা না পাইলে, তাঁহার কথা না শুনিলে কেহ আর তাঁহার কথা বলিত না। ধর্ম্মের ইতিহাসে আদি সময় হইতে যে জীবন্ত বিশ্বাসের অঙ্কুর মানবজীবনে দেখা যাইতেছে, যাহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মহামতি স্পেন্সর সাহেবও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাসের মূল তাহা হইলে ছিন্ন হইত। তিনি দেখা দিয়া জগৎকে সর্ব্বদা আশ্বাসিত করিতেছেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ

না পাইলে কি শোকে লোক সান্ত্বনা পাইত ? বিপদে বাঁচিত ? অভিমন্যুকে চন্দ্রলোকে শ্রীকৃষ্ণ যদি শাপ-মুক্ত অবস্থায় না দেখাইতেন, তবে অর্জ্জুন কি আর সংসারলীলা করিতে পারিতেন ? মৃত্যুকে যিনি জগতে রাখিয়াছেন, মৃত্যুর পর সান্ত্বনাকেও তিনি জগতে প্রেরণ করিতেছেন। বিধাতার করুণার কথা ভাবিলে পাষাণ কাটিয়াও প্রেমজল নির্গত হয়।

দেবধামের দেবকন্যা "অপরাজিতা" আসিয়াছিল। পাপীর হৃদয়ে পুণ্যের বার্ত্তা শুনাইতে, মোহাচ্ছন্নদিগকে মোহমুক্ত করিতে,শুষ্ক মরুভূমিতে প্রেমবারি সিঞ্চন করিতে সেই দেবকন্যা অপরাজিতা মর্ত্ত্যধামে আসিয়াছিল। আমি বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, "এ শিশু সংসার-সংগ্রামে অপরাজিতা থাকিয়াই যেন চলিয়া যায়"—এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্যই বুঝি বা বিশ্বেশ্বর এ কাঙ্গালের সাতরাজার মাণিক হরণ করিয়া লইলেন ! কত চেষ্টা করিলাম, সে প্রেমময়ী রহিল না। তার চখে মুখে কত প্রেমের আভা ফুটিল, অস্ফুট ভাষায় সে কত স্বর্গের কথা বলিল, তার পর আমাদিগের মায়ায় আবদ্ধ নয়, ইহা বুঝাইল, বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায় সে প্রয়াণ করিল। তাহার জন্য আমি বড়ই আকুল হইলাম। ঘোর বিপদেও বিধাতার কৃপায় যে দেহ মৃত্তিকায় লুটায় নাই, আমার সে দেহ ধরাশায়ী হইল। আমার সে আকুলতা, আমার সে ধরালুণ্ঠন, পৃথিবীর কোন লোক বুঝে নাই। কাঁদিলাম ত হৃদয় ভাঙ্গিয়া কাঁদিলাম, শোক-সাগরে ঝাঁপ দিলাম ত প্রাণ মনের আশা ছাড়িয়া ঝাঁপ দিলাম। আবার সংসার করিব, সে আশা তখন রাখি নাই। আবার পৃথিবীর পরিচর্য্যা করিব, সে বাসনা রাখি নাই। সব আসক্তি ডুবাইয়া অকূল শোকসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলাম। সে অকূলে কত নীরব এবং সরব প্রার্থনা-ধ্বনি উঠিয়াছিল, পৃথিবীর কোন লোক তাহা জানে না। অকূলের কূল আমার কথা বড় শুনেন। যখন যা চাই, তখন তিনি তাহাই দেন। বাল্যকাল হইতে তিনি কাঙ্গালের আবদার শুনিয়া কত কি দিয়াছেন, কে জানে ? আমি তাহা বলিতে পারি না, তাহা আমি বলিতে চাহি না। আমি পাপ-রাজ্যের প্রধান দাস, আমি ধন-রাজ্যের প্রকাণ্ড দস্যু, আমাকে তিনি এত দয়া করেন, আর তোমাদিগকে তিনি ভুলিয়া থাকেন, আমি এ বিশ্বাস করি না। তিনি যেমন আমার, তিনি তেমনি তোমার। তিনি আমার ডাকে যেমন হাজির হন, তুমি যদি তাঁকে ডাক, তবে তিনি তখনি তোমার নিকট হাজির হইবেন ; প্রত্যক্ষ কথা। ধর্ম্ম, কল্পনা বা তর্ক যুক্তির

জিনিষ নয়। তাহা হইলে পৃথিবীতে এত লোক ইহা লইয়া থাকিত না। তাহা হইলে এত লোক ধর্ম্মের জন্ত সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পারিত না। আমি বলিতেছিলাম, তিনি দরিদ্রের কথা শুনেন। অপরাজিতার শোকে কাতর হইয়া, অনন্যগতি হইয়া অকূল শোকের অবস্থায় একদিন প্রার্থনা করিতেছিলাম, "তুমি কি তাহাকে আবার ধরায় আনিতে পার না? তোমার পক্ষে তাহা কি অসম্ভব? তুমিত সবই পার। দেব, আমার বিনীত প্রার্থনা, সেই কুসুমকে আবার এই মরুভূমিতে ফুটাও।" সেই দিন রাত্রেই স্বপ্ন দেখিলাম, অপরাজিতা আবার আসিবে। আমার শরীর কম্পিত হইল, রোমাঞ্চিত হইল, কিছুই ভাল বুঝিতে পারিলাম না। পরদিন এ কথা ব্যক্ত করিলাম। কি আশ্চর্য্য, সত্যই সত্যই কিছুদিন পরে ঘটনা সত্য বলিয়া প্রমাণ পাইলাম। আমি মনে মনে বলিলাম,এবার বিধাতার করুণা জলন্তভাবে অবতীর্ণ হইবে। এ কথা দুই একজন বন্ধুকেও বলিলাম। আমার দুইজন বন্ধু বিশ্বাস রাজ্যের রাজা, তাঁহারা বলিলেন, তাঁহার দয়ায় অসম্ভব কি? দশ মাস পরে আশ্চর্য্য ফল পাইলাম, দেখিলাম, অপরাজিতার দারুণ শোক-সাগরে "সান্ত্বনা" ভাসিতেছে। আমার সেই দুই জন বন্ধু তখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, অপরাজিতা সবল ও সুস্থ দেহ লইয়া আবার অবতীর্ণা হইয়াছে। অপরাজিতা সান্ত্বনা রূপে অবতীর্ণা হইলে আমরা বিস্ময়ে ডুবিলাম। বিধাতার যে জাগ্রত কৃপায় অহঃরহ ডুবিয়া রহিয়াছি, সেই কৃপার এ আর এক বিকাশ। আমি ডুবিলাম, মজিলাম। তর্ক যুক্তি ছাড়িলাম, পদানত ভৃত্য হইলাম। সংসারের ভার তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম। ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, বলিলাম, এখন বিধাতাই কেবল বলিতে পারেন, সেই "অপরাজিতাই" এই "সান্ত্বনা" কি না। আমরা বড় ভীত ব্যক্তি, সাহস করিয়া বিশ্বাসের কথা বলিতে ভীত হই। শিশুর নাম রাখিয়াছি, "সান্ত্বনা।" এই শোকের অবস্থায় যাহা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহার নামও রাখিলাম "সান্ত্বনা"। এ উভয়ই, শোকের দিনে, আমার হৃদয়ে সান্ত্বনারূপে অবতীর্ণ হইয়াছে, ইহাদের লইয়াই ঘোর দুর্দ্দিনে ছিলাম। এই চিন্তা-শিশুগুলি এক সময়ে মনে ক্রীড়া না করিলে আমি বাঁচিতাম না; তার পর ঐ অমর জগতের দেবকন্যা না আসিলেও বুঝি বা পৃথিবীর দারুণ অত্যাচার-ঝটিকায় মরিতাম, অপরাজিতার পর সতীশচন্দ্র, তারপর অরবিন্দ, তারপর গিরিজাসুন্দরী, তারপর বিদ্যাসাগর, দুই বৎসরের মধ্যে এতগুলি লোকের শোকের আগুন এ হৃদয়ে জলিয়াছিল। সেই শোকের আগুনে

জন্মিয়াছে—এই 'সান্ত্বনা'। দেব আশীর্ব্বাদ পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দেবতার নিকট প্রণত হইতেছি; কিন্তু জগতের কোন উপকার বা সেবায় ইহা লাগিবে কি না, যিনি সকল ঘটনার প্রবর্ত্তক, তিনিই জানেন। আমরা তাঁহার দাসানুদাস, গোলাম, সে কথা কিছুই বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস, "অপরাজিতা" আজ "সান্ত্বনা" রূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা। বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা। পৃথিবীর লোক কি তাহা বিশ্বাস করিবে? না করুক, বিশ্বাসের কথা চিরকাল জলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকুক।

মানব, জীব-লীলায়, এই পৃথিবীতে বহুজন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, অনেকে বিশ্বাস করেন; কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষ আবার ফিরিয়া আইসে, ইহাতে অনেকের সন্দেহ আছে। আমরাও এই দলভুক্ত ছিলাম। কিন্তু বিশ্বাসের উদয়ে নাকি সকল মত-কুয়াসা উড়িয়া যায়, আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। পূর্ব্বে মতের দাস ছিলাম, এখন এ সম্বন্ধে বিশ্বাসের দাস হইয়াছি। প্রত্যক্ষের নিকট মত বলি দিতে হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ বিশ্বাস করি না যে, সকল লোকই মৃত্যুর পর আবার শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবে। এ সকল সম্বন্ধে আমাদের মতের ধান্দা এখনও ঘুচে নাই; অথবা, আমরা নিশ্চয় কিছুই বলিতে পারি না। সেই মহা-চক্রীই জানেন, আর সকল মানুষ মরণের পর কোথায় যায়। সাধুপ্রাণিত বিশ্বাসের অভ্যুদয় না হইলে কে এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারে?

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত পুস্তক সকল নিম্নলিখিত মূল্যে কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

১।	শরচ্চন্দ্র। (উপন্যাস) (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৸০
২।	বিরাজমোহন। (সামাজিক উপন্যাস) (তৃতীয় সংস্করণ।)	১।০
৩।	সন্ন্যাসী। (পার্ব্বতীয় উপন্যাস) (তৃতীয় সংস্করণ।)	১৲
৪।	ভিখারী। (সামাজিক উপন্যাস) ঐ	১৲
৫।	যোগজীবন। ঐ	১৲
৬।	নবলীলা ঐ ..	১ ০
৭।	অপরাজিত। (উপন্যাস) ..	১৶
৮।	সুরমা। (বিষাদ কাহিনী) —	৷০
৯।	সোপান। (নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ) (দ্বিতীয় সংস্করণ।)	১৲
১০।	বিবেকবাণী। (বিবিধ প্রবন্ধ)	৸
১১।	জ্যোতিকণা। ঐ	১।৶
১২।	প্রসাদ। ঐ	১৴০
১৩।	বিবাহ-সংস্কার ঐ ...	১৲
১৪।	সান্ত্বনা। (বিবিধ প্রবন্ধ)	৸০
১৫।	ভ্রমণ বৃত্তান্ত।	১৲